জোসনা রাতে – শুজা রশীদ

এক

টাউটগিরির ম্যালা ঝামেলা!

শামসু তালুকদারের কথাটাই ধরুন না। তুই ব্যাটা বুড়ো হাবড়া, টাকা পয়সা আছে বলেই কি সতেরো আঠারো বছরের ছুঁড়ি খুঁজবি? একটা কা-জ্ঞানের ব্যাপার আছে না! তালুকদার যখন জ্বলজ্বলে চোখে ঠোঁটের ডগায় বাঙ্গির ফালির মতন চওড়া একখানা হাসি ঝুলিয়ে প্রস্তাবটা দিলো, ইচ্ছে হচ্ছিলো দুম করে নাকের ডগায় একটা ঘুষি বসিয়ে দেই।

—কটা লাগবে, স্যার?

ঠা ঠা করে হেসে উঠলো তালুকদার।—তোমার কথায় বড় মজা হে, বড় মজা!

তোর মজার শ্রাদ্ধ করি। ব্যবস্থা অবশ্য ঠিকই করতে হলো। পাঁচ শ' টাকা ঝুলিতে এলো। এই আমার ব্যবসা, দুয়ে দুয়ে মিলিয়ে দেয়া। বিবেক-টিবেকের পরোয়া করলে চলে না, ব্যবসা লাটে উঠবে। তবুও মনের একটা ব্যাপার আছে না! মাঝে মাঝে সেটা বডডো ঝামেলা পাকায়। কি নোংরা! কি নোংরা! এসব তুই কি করিস্‌রে সৈকত, অ সৈকত-

সারাদিনের কতো সব তিক্ত অভিজ্ঞতা, তারপর বাসায় ফিরে যদি দেখি দরজার কড়ায় আমার রদ্দিমার্কা ডায়ম- তালার গলা জাপটে এক দশাসই চেহারার ঝক্‌ঝকে তালা ঝুলছে মেজাজটা কোথায় থাকে বলুন? না হয় মাস দুয়েকের ভাড়া বাকি পড়েছে, তাই বলে এই রকম অর্বাচীনের মতো ব্যবহার? দুম্ দুম্ করে পুরো দালান কাঁপিয়ে দোতলায় উঠলাম। কলিং বেলে হাত ছোঁয়ানোর আগেই চিচিং ফাঁক। কাঁচাপাকা দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে মিষ্টি করে হাসলেন সিরাজ আলী।

—আসুন, ভিতরে আসুন, বড় কষ্ট দিলাম আপনাকে।

—আমাকে ভদ্রভাবে ডেকে পাঠালেও পারতেন।

—নিশ্চয় পারতাম। কিন্তু আপনার যে দেখাই পাওয়া যায় না, বাবা। গতরাতে বারোটা পর্যন্ত জেগে বসেছিলাম। আপনি ফিরলেন না। সকালে আবার বেরিয়ে গেলেন ভোর ছ'টায়, দেখা হলো না। তাই বাধ্য হয়ে- বুদ্ধিটা খারাপ না, কি বলেন?

হেসে ফেললাম, লোকটা ভালই। বুদ্ধি-শুদ্ধিও চমৎকার। যে কোন বিশ্রী পরিস্থিতি সামাল দিতে ওস্তাদ।

—আপনার বাকি ভাড়াটা আগামী মাসে-

—না না বাবা, আর আগামী মাসে না। আপনি কি করেন আমি জানি না, কিন্তু এটুকু বুঝি আপনাকে অনেক কষ্ট করে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। বাড়ী ভাড়ায় প্রতি মাসে তিন হাজার অপচয় করাটা আপনার জন্য ঠিক না।

—আপনি কি আমাকে চলে যেতে বলছেন?

—না বাবা, আপনাকে আমি ট্রান্সফার করছি।

—ঠিক বুঝলাম না।

—আপনাকে আমি আমার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ার বাসায় পেয়িং গেস্ট হিসাবে থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তাদের সাথে কথা বলেছি, তাদের কোন আপত্তি নেই। এখন আপনার মর্জির উপর নির্ভর করছে।

পেয়িং গেস্ট বলে কি! আমার মতো উজবুককে কেউ যেচে পড়ে বাসায় রাখতে রাজী হয় নাকি? নির্ঘাৎ মাসখানেকের মাথায় মানে মানে কেটে পড়তে বলবে।

দুঃখিত সিরাজ সাহেব। বহু দিন হলো আমি পারিবারিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। বলতে পারেন, পুরোপুরি উড়নচ-ী হয়ে পড়েছি। এই অবস্থায় কোন ফ্যামিলির সাথে খাপ খাওয়াতে পারবো বলে মনে হয় না।

সিরাজ আলী হাসতে লাগলেন। —এই জন্যেই আপনাকে আমার এতো ভালো লাগে, বাবা। আপনার মধ্যে এক ধরনের সারল্য আছে। ইদানিং এসব আর দেখা যায় না। যাই হোক, আপনার অতো দ্বিধা করার কিছু নেই। যাদের সাথে আপনাকে থাকতে হবে তারা খুবই সহজ সরল মানুষ। আমার দূরসম্পর্কের চাচাতো ভাইয়ের পরিবার। ভাইটা অকালে ক্যান্সারে মরেছে। বড় ছেলেটা ঘর জামাই হয়ে আছে। বেচারি ভাবী তার ছেলে-মেয়ে নিয়ে বডডো বিপদে আছেন। সে জন্যেই বলছিলাম, আপনি যদি ওখানে থাকেন তাহলে ওদের বড় উপকার হতো।

নেও ঠ্যালা, দুনিয়ার যতো আপদ সব আমার কাঁধে। আরে, আমার নিজেরই তো নাওয়া-খাওয়ার ঠিক নেই, আমি আবার মানুষের কি উপকার করবো!

–কিন্তু বলছিলাম কি-

–উহু। আর কোন কিন্ত নয় বাবা। আপনার বাকি ভাড়ার

টাকাটা আমি শুভেচ্ছা স্বরূপ মওকুফ করে দিলাম। এই কাগজটায় ঠিকানা লেখা আছে, যত্ন করে রেখে দিন। কাল-পরশু যে কোন একদিন জিনিষপত্র নিয়ে চলে যান ওখানে। আপনার কোন অসুবিধা হবে না।

–কিন্তু মাসে মাসে ওদেরকে কতো দিতে হবে তাতো কিছু বললেন না?

–দেখুন বাবা, এতে আর বলাবলির কি আছে? আপনি সামর্থ মতো যাই দেবেন ওরা তাই নেবে। কোন জোর জুলুমের ব্যাপার নেই। তাহলে সব ঠিক ঠাক হয়ে গেলো, কি বলেন? ও চম্পার মা, এখানে দু'কাপ চা দাও।

–জ্বি না, আমি এখন চা-টা খাবো না। আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। আপনি চাবিটা দিন।

সিরাজ আলী মুচকি হাসলেন। –চাবি-টাবি লাগবে না, আস্তে করে ধাক্কা দিলেই তালাটা খুলে যাবে। তালাটা নষ্ট, বুঝলেন কিনা। ঘষে মেজে ঝক্‌ঝকে করে রেখেছি, মাঝে সাঝে একটু মজা করা যায়।

ও!

মজা, মজা আর মজা। শালার দুনিয়াশুদ্ধু সবাই আমাকে নিয়ে শুধু মজা লুটতে চায়। আমি কি সার্কাসের ক্লাউন, এ্যাঁ? যাক গিয়ে, সিরাজ আলীকে মাফ করা যায়। পাক্কা ছ'হাজার টাকার মামলা ডিসমিস। মন্দ না! পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকার ব্যাপারটি কি রকম কে জানে? খারাপ লাগলে বেরিয়ে পড়লেই হলো। মুক্ত মানুষ মুক্ত জীবন, অতো ভাবনা কিসের?

পর দিন সকালে ঘুম ভাঙলো কলিং বেলের প্রাণ কাঁপানো শব্দে। ঘড়ি দেখলাম, আটটার কিছু বেশি। কি যন্ত্রণারে বাবা! এই ভোর সকালে আবার কোন শালা জ্বালাতে এলো? আমি কি এমন দরকারি লোক যে পৃথিবীর সব কাজ ফেলে সকাল আটটায় আমার দরজার কড়া নাড়তে হবে! ধেৎতরি, উঠবোই না। বাজাক, বাজিয়ে বাজিয়ে হাতের সুখ মেটাক, এই আমি দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুম দিচ্ছি।

দশ মিনিটের মাথায় দুটো জঘন্য গাল কষে বিছানা ছাড়লাম। কানের দফারফা হয়ে যাচ্ছে। ভেবেছিলাম দরজা খুলেই ব্যাটাকে এয়সা ধমক দেবো—মাধুরীর প্রসাধনচর্চিত সুন্দর মুখখানা দেখে থমকে গেলাম। মাধুরী মিষ্টি হেসে বললো-কি গো প্রাণেশ্বর, ঘুমাচ্ছিলে বুঝি?

বিরক্ত মুখে বললাম-হ্যাঁ। তুমি হঠাৎ কেন এসেছো?

—এমনিই এলাম। মানুষ মানুষের বাসায় আসতে পারে না! কি হলো, আমাকে ভেতরে ঢুকতে দেবে না? নাকি দোর গোড়া থেকেই বিদায় নিতে হবে?

—ঢোকো ঢোকো, জ্বালানোর আর সময় পাও না।

মাধুরী রিমিঝিমি গলায় হেসে উঠলো। আমি ইচ্ছে করেই অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম, হাসলে ওকে সাংঘাতিক সুন্দর দেখায়। আমার হার্টবিট বেড়ে যায়।

—কি করবো, তোমাকে জ্বালাতে যে বড় ভালো লাগে।

—তাই বুঝি? কেন, তোমার নাগরের অভাব পড়েছে?

—ছিহ, সৈকত, এভাবে কথা বলো না। তোমার কাছে আমি সবকিছু ভুলে যেতে আসি, তুমিও যদি আমাকে খোঁটা দাও, তাহলে আমি কার কাছে যাবো?

—খুব ন্যাকামী করতে শিখেছো!

—আমার সব কিছুই তো তোমার কাছে ন্যাকামি মনে হয়। ও কি, কোথায় যাচ্ছো?

—ঘুমুতে।

—কি আশ্চর্য! আমি তাহলে একাকী কি করবো?

—যা খুশী করে বেড়াও। কিন্তু আমার ঘুম ভাঙালে এলাহি কা- বাঁধিয়ে দেবো।

মাধুরী মৃদু শব্দে হেসে উঠলো- সৈকত, তুমি আসলে আমাকে খুব ভালোবাসো। তাই না?

দরজার সামনে থেকে ঘুরে দাঁড়ালাম।—কি বললে?

—না বললাম, আমি তোমাকে খুউব ভালোবাসি।

—বেশী ফালতু কথা বলবে না।

ঘুরে চলে আসছি, পেছনে ওর চাপা হাসির শব্দ কানে এলো। আমাকে ক্ষেপিয়ে কি যে এতো মজা পায় মেয়েটা! কতো বড় বড় রাঘব বোয়ালদের সমাজে ওর যাতায়াত, কতো ওর শুভাকাংখী, পুজারী, স্তাবক, তবুও কেন যে জ্বালাতে আমার কাছেই আসে, আল্লাই মালুম। মরুকগে সব, আমার দু'চোখ উপচে ঘুম আসছে, ধপাস করে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

ঘুম থেকে উঠেই মাধুরীর খোঁজ করলাম। ওর সাথে অতোটা খারাপ ব্যবহার না করলেও চলতো। আর যাই হোক, আমার উপকার ছাড়া ক্ষতি কখনো করেনি ও। ড্রয়িং রুম, কিচেন, টয়লেট সব জায়গায় ঢুঁ দিলাম। নেই। মাধুরী চলে গেছে। অবাক কা-, মাধুরী কখনো এভাবে চলে যায় না। আজ হঠাৎ নিয়মের ব্যতিক্রম হলো কেন? কোন-বিপদ- তখন তো কিছু বললোও না। মনটা একটু খারাপ হয়ে গেলো। মাধুরী কি আমার উপর রাগ করলো?

○ ○ ○ ○ ○

আমাকে দেখেই তিড়িং করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো আজাদ চৌধুরী। মাঝ বয়সী মানুষ, ফর্সা রং, সুন্দর চেহারা। এই মুহূর্তে তার চোখে মুখে সবিশেষ উত্তেজনার চিহ্ন।

–সৈকত, তোমার যদি কোন কা-জ্ঞান থাকে। গত দু'দিন ধরে আমি তোমার খোঁজে সারা ঢাকা শহর চষে বেড়াচ্ছি। কোথায় থাকো, না থাকো, একটু জানিয়ে রাখতে পারো না? দরকারের সময়েই যদি তোমাকে না পাওয়া যায়-

আমি বেশ নির্লিপ্ত মুখে একখানা চেয়ারে জাঁকিয়ে বসলাম। বোঝাই যাচ্ছে, যে কোন কারণেই হোক ব্যাটা বেশ ঝামেলায় আছে। ডাঁট দেখানোর এটাই সময়। এই ধরনের সুযোগ কচিৎ কদাচিৎ পাওয়া যায়। বিপদের সময়েই যা একটু বাবা-বাছা, সমস্যা ফুরালেতো সৈকতও 'কেমন আছো? ভালোতো'-র পর্যায়ে চলে যাবে। যেমন কুকুর তেমন মুগুর-এটাই আমার সাফল্যের চাবিকাঠি।

–অতো ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, স্যার? কি হয়েছে তাই বলুন। আমি থাকতে আপনার চিন্তা কি? তবে তার আগে একটু ঠা-া কিছুর ব্যবস্থা করুন। বাইরে যা রোদ, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে!

'শিওর, শিওর।' বেলটিপে পিওনকে ডাকলো। 'রমজান, ফাষ্টক্লাশ দেখে এক গ্লাশ ফালুদা নিয়ে এসো। যাবে আর আসবে।'

ঠ্যালার নাম বাবাজী! শালা, এখন ফালুদা খাওয়াচ্ছো, দু'দিন আগে হোটেল পূর্বানীতে যখন জমজমাট এক পার্টি দিলে তখন সৈকতের কথা মনে পড়েনি? তোমার পি- চটকায়ে আমি মা কালীর ভোগে লাগাবো।

আজাদ গলা নামিয়ে বললো –সৈকত, ভীষণ বিপদে পড়েছি। বুঝলে, বিপদ মানে বিপদ, ব্যাপারটা তোমাকে খুব সিরিয়াসলি ডিল করতে হবে।

আমার কোন তাড়া নেই। আমি ফালুদার জন্য অপেক্ষা করছি। মাধুরীটা যে কি, কিছু না বলে কয়ে এভাবে চলে আসাটা কি ওর উচিৎ হয়েছে? না হয় খানকতক কটুকথা বলেছি, সেতো হররোজই বলি। নাহ, এই মেয়ে জাতটার মেজাজের কোন কুল কিনারা নেই। আজাদ শালা বডডো বকবক্ করছে। ফালুদার গ্লাশে চুমুক না দিয়ে আমি তোমার একটা কথাও কানে ঢোকাচ্ছি না, বাহে। হুঁ হুঁ, এই বান্দার নাম সৈকত।

–বুঝলে, সব সিক্রেট ফাঁস হয়ে গেছে, সব, উত্তেজনায় টেবিলের উপর উবু হয়ে পড়েছে আজাদ, ব্যাটাচ্ছেলেরা যে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে তারও কোন হদিস পাচ্ছি না। ভয়ংকর বিপদ ..... এসো রমজান, ওখানে রাখো। নাও সৈকত। রমজান, বাইরে যাও ---- হ্যাঁ, যা বলছিলাম ------

ফালুদার গ্লাশে দীর্ঘ এক চুমুক দিয়ে, স্ট্রটাকে ডান হাতের মধ্যমার ডগায় আলতো করে চেপে ধরে ঘোরাতে ঘোরাতে বললাম, ---- হুঁ এবার বলুন আপনার সমস্যাটা কি?

আজাদ পাক্কা দশ সেকেন্ড বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলো। ---- সে কি! তুমি এতক্ষণ কিছুই শোন নি?

–সরি, অন্য একটা ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করছিলাম।

মেজাজ খারাপ করলো না আজাদ, ছোট্ট একটা হতাশার নিশ্বাস ছাড়লো। --- ঠিক আছে, আবার প্রথম থেকেই বলছি। এবার দয়া করে মন দিয়ে শোন। আমার ব্যবসার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সিক্রেট ফাঁস হয়ে গেছে, ব্যাপারটা পুলিশের কানে গেলে নির্ঘাৎ জেলের ঘানি টানতে হবে। জানইতো স্মাগলিং এর ক্ষেত্রে ইদানিং আইন খুব কড়া। সাজ্জাদরা --

–সবইতো বুঝলাম, কিন্তু আমাকে কি করতে হবে, তাই বলুন।

–তোমার কাজ হচ্ছে ঐ লোফার দুটোকে খুঁজে বের করে ওদের একটা চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করা। কি, পারবে না?

–বলেন কি? একেবারে মার্ডার?

—এছাড়া উপায় নেই। শালারা ব্লাকমেইলিং করছে আমাকে, দশ লাখ টাকা হেঁকে বসেছে, চিন্তা করতে পারো? খান কতক জরুরী কাগজপত্র রয়েছে ওদের হাতে, সেগুলোও উদ্ধার করতে হবে। হাতে সময় কিন্তু খুব কম।

গম্ভীর মুখে বললাম --- খুব রিস্কের কাজ মি: আজাদ। একটু এদিক ওদিক হলেই আমার গলাতেই দড়ি পড়বে।

—বুঝেছি বুঝেছি। টাকা পয়সা নিয়ে কোন চিন্তা করো না। ড্রয়ার থেকে ছোট্ট একটা বা-লি বের করে আমার হাতে গুঁজে দিলো সে। 'পাঁচ হাজার আছে। জলদি কাজ শুরু করো। এই রকম টেনশনে আর কটাদিন থাকলে নির্ঘাৎ হার্ট এটাক হয়ে যাবে।'

নির্বিকার মুখে টাকার বা-লিটা পকেটে ঢুকিয়ে ধীরে সুস্থে চেয়ার ছাড়লাম। ফালুদার অর্ধেকটাই পড়ে থাকলো, কিন্তু এখানে আর বসে থাকাটা সমীচীন নয়, মর্যাদা ক্ষুন্ন হবে। বাইরে কোথাও গিয়ে আরেক গ্লাশ খেয়ে নিলেই হবে।

—কোন চিন্তা করবেন না, স্যার। সাজ্জাদের ব্যবস্থা করতে দিন দুইয়ের বেশী সময় লাগবে না। আমি কাল এসে কতদূর কি হলো আপনাকে জানিয়ে যাবো।

মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকার ব্যস্ত ফুটপাথে নেমে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম। কি ঝলমলে রোদে ভরা একটি দিন! রিক্সা, কার, বাসের সম্মিলিত গর্জন, অজস্র মানুষের চলাচল, উষ্ণতা, আমি একখানা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি। কি নোংরা! কি নোংরা! এ তুই কোথায় চলেছিসরে সৈকত, অ সৈকত ---- ইচ্ছে হয় সব অন্যায়, পাপ ধুয়ে মুছে ঐ অবসন্ন মানুষের ভীড়ে মিশে যাই, হাঁটতে থাকি অবিকল কোন দরিদ্র কেরানীর মতো, ফিরে যাই অভাব জর্জরিত প্রিয় কোন সংসারে --- যাহ, পাগল!

মাধুরীর একটা খোঁজ নেয়া দরকার, আমার উপর কখনো রাগ করে না ও, আজ করলো কেন?

মাধুরীর দেখা পেলাম টিকাটুলিতে, সাঈদার বাসায়। আমাকে দেখেই ছুটে এসে গলা জড়িয়ে ধরলো। -- হ্যাঁরে সাঈদা, বলিনি তোকে আমার প্রাণেশ্বর আজ আসবেই আসবে। হ্যাঁ গো, তুমি কি করে বুঝলে আমি এখানেই আছি? নিশ্চয় মন বলছিলো। ঠিক না?

আমি দাঁত কিড়মিড় করলাম। -- এক থাপ্পড়ে তোমার বত্রিশ পাঁটি দাঁত খুলে ফেলবো।

সঙ্গে সঙ্গে গাল পাতলো। -- মারো, মারো না, লজ্জা কি!

ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলাম ওকে। -- না বলে চলে এলে কেন?

—দেখলাম তুমি আমাকে কতোটা ভালোবাস।

—আচ্ছা! ভেবেছো তোমার খোঁজে এসেছি বলেই তোমার প্রেমে আমি পাগলপারা? গর্দভ কোথাকার!

—কেন, আমাকে বুঝি ভালোবাসা যায় না? আমি দেখতে খুব কুৎসিৎ?

—ফালতু কথা বলবে না। সাঈদা, আমাকে এক কাপ চা দাও।

সাঈদা হাসতে হাসতে বললো---সৈকত ভাই, ও কিন্তু সত্যি সত্যিই এতক্ষণ আপনার কথাই বলছিলো।

—হ্যাঁ, আমি ওর ইয়ে কিনা! যাও, তাড়াতাড়ি চায়ের ব্যবস্থা করো। আমাকে আবার এক্ষুনি বের হতে হবে।

—আনছি। আপনি একটু ঠা-া হয়ে বসুনতো।

সাঈদা ভেতরে যেতেই গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো মাধুরী্। কি যন্ত্রণারে বাবা! —এই মাধুরী এসব কি হচ্ছে?

—বেশী বকোনাতো। সাঈদা আসার আগেই চটপট দুটো চুমু খাও।

ওর চোখের কোণে কৌতুকের ঝিলিক দেখেই, বুঝলাম, ইয়ার্কি মারছে। এই ওর এক বদভ্যাস, আমাকে সামনে পেলেই যা তা ঠাট্টা মসকরা শুরু করে।

—আচ্ছা মাধুরী, একটা কথা বলি, কিছু মনে করো না।

—এই বোকা, তোমার কথায় আমি আবার কবে কি মনে করলাম, বলো কি বলবে।

—আমাকে তুমি কি পেয়েছো বলতো? ইয়ার্কি ঠাট্টারও তো একটা সীমা থাকা উচিত, তাই না?

মাধুরী হাসিতে ফেটে পড়লো। --- সাঈদারে, আমার প্রানেশ্বর ক্ষেপেছে। চা'র সাথে খানিকটা বরফও নিয়ে আসিস।

আমার বেশ রাগ হয়ে গেলো। আমি কি জোকার যে সিরিয়াসলি একটা কথা বললেও ও হাসবে? হাসুক, হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে ধরুক। আমার প্রাণ জুড়াক।

—সাঈদা। চা লাগবে না। আমি চলে যাচ্ছি।

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই হলো, দৌড়ে এসে দু'হাতে দরজা ঢেকে দাঁড়ালো মাধুরী। ঘন রেশমী চুলের ঝাঁকে মৃদু হিল্লোল তুলে চোখের ভ্রু-ট্রু মনি-টনি নাচিয়ে দু'ঠোটের ফাঁকে উথাল পাথাল করা এক টুকরো হাসি ঝুলিয়ে ফেললো।

–ইস। আমি যেতে দিলে তো।

–ঝামেলা করো নাতো, আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।

ঠোঁট ওলটালো।–ভেবেছে ওনার কাজের খবর আমি রাখি না।

–মানে?

–মানে টানে কি আবার। চৌধুরীর ওখানে গিয়েছিলে, ঠিক কিনা?

–তুমি জানলে কি করে?

আবার সেই অদম্য হাসিতে ফেটে পড়লো মাধুরী। ওর উদ্ধত, নিটোল স্তনের উপর থেকে শাড়ীর আঁচল খসে পড়লো, ধবধবে ফর্সা মসৃণ উদরে চোখ আটকে গেলো আমার। পরক্ষণেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম। শালার অক্ষি, বডডো বাড় বেড়েছে, না!

–সৈকত, তুমি কি বলতো? আমি কিভাবে খবর পাই তুমি জানো না?

–জানবো না কেন? তবে আমি তো আর তোমার পেছনে গোয়েন্দা লাগাইনি। জানবো কি করে কবে কার সাথে ডেটিং করছো?

মাধুরী শাড়ীর আঁচল দিয়ে দু'চোখের উপচে পড়া পানি মুছতে মুছতে বললো - চৌধুরীটা একটা রাম ছাগল। পেটে দু'পেগ পড়লেই এমন বকর বকর করে না, একেবারে ঝালাপালা করে ছাড়ে।

–আমি ওসব শুনতে চাইনি। পথ ছাড়ো।

–আমি কিন্তু জানি, সাজ্জাদরা কোথায় আছে।

–জানো, বেশ হয়েছে। সরো।

–তুমি জানতে চাও না?

–চেষ্টা করলে আমি নিজেই জানতে পারবো।

–কেন আমার কাছ থেকে শুনতে আপত্তি কিসের?

আমি সন্দেহ ভরা দৃষ্টিতে ওকে জরিপ করলাম । ওরতো কিছু জানার কথা নয় ।

—সত্যি সত্যিই জানো নাকি?

—তো!

—আরে ধেৎ অতো ঢং করার দরকার কি? জানলে তাড়াতাড়ি বলো । অনেক টাকার ব্যাপার ।

মাধুরী মিটি মিটি হাসতে লাগলো । —বললে আমার কি লাভ?

থমথমে মুখে বললাম—টাকার ভাগ চাও?

—যদি চাই, দেবে?

—কেন দেবো না? আধা আধি হলে চলবে?

মাধুরী এগিয়ে এসে আমার প্রায় লোমহীন বুকে হাত রাখলো । —টাকা পয়সা চাইনা, প্রাণেশ্বর । তুমি আমাকে একটু আদর করো ।

—মাধুরী, তুমি কি কানে কম শোন? তোমাকে না কতদিন বলেছি এই কাজ আমাকে দিয়ে হবে না ।

—কেন, আমি স্বৈরিণী বলে?

—না, সেজন্যে নয় । এসব আমার ভালো লাগে না ।

—ইস ভালো লাগে না বললেই হলো! একবার এই মজা পেলে তখন আর আঁচল ছেড়ে নড়বেই না ।

ঠাস্ করে একটা চড় বসিয়ে দিলাম ।

মাধুরী হাসতে হাসতে বললো--- ভালো লাগলো?

—লাগলো ।

গট গট করে হেটে বাইরে বেরিয়ে এলাম । চড়টা মারা ঠিক হয়নি, কিন্তু মাফ চাইতেও কেমন লাগছে । মাঝে মাঝে কি যে হয় আমার?

মাধুরী পিছু ডাকলো--- এই সৈকত, যেও না, সাঈদা তোমার জন্য চা এনেছে ।

আমি না শোনার ভান করে লম্বা লম্বা পায়ে হাঁটতে লাগলাম । মাধুরীকে এর আগেও দু-চারটে চড়-চাপটা মেরেছি কিন্তু এতো জোরে কখনো মারিনি । খুব কি ব্যথা পেয়েছে? পেয়েছে মনে হয় । কি যে

হলো হঠাৎ? মিনিট পাঁচেক পর আবার ফিরতি পথ ধরলাম। মাফটাফ না চাইতে পারি, মাধুরীর সামনে অপরাধী মুখ করে অন্তত একবার দাঁড়ানো দরকার।

মাধুরী দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিলো। আমাকে দেখেই হাসলো। –ও সাঈদা, বললাম না তোকে, প্রাণেশ্বর আমার ফিরবেই।

সাঈদা চোখ বড় বড় করে বললো – ও মা, আপনি সত্যি সত্যিই ফিরে এলেন? আপনাদের ব্যাপার স্যাপার কিছুই আমার মাথায় ঢুকছে না।

গোমড়া মুখে বললাম – বল তো চলে যাই।

–না, না, ছিঃ, যাবেন কেন? ভেতরে এসে বসুন, চা খান। দুপুরে তিনজন একসাথে খাবো।

–নাহ, অতক্ষণ থাকা যাবে না, আমার কাজ আছে।

মাধুরী আমার হাত চেপে ধরলো। –কাজ না ছাই, টাউটগিরি করার চেয়ে গলায় দড়ি দেয়া ভালো। ভেতরে ঢোকো তো।

কি আর করা। অন্যায় যখন একটা করেছি, অন্যায় আব্দার দু'চারটে রাখতে তো হবেই।

রাইসুলকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে জানতাম। সন্ধ্যা হলেই ওরা দল বেঁধে সাকুরায় আড্ডা দেয়, মদ-টদ খায়। আধো আলোতেও আমাকে দেখেই চিনে ফেললো রাইসুল। হালকা পাতলা শরীরের লম্বাটে মানুষ, তীক্ষ্ণ চোখ।

–আরে, সৈকত ভাই! আসেন, আসেন! অনেকদিন পর দেখা হলো!

–তোমার সাথে কথা ছিলো, রাইসুল।

–জানি, জানি, দরকার না থাকলে কেউ রাইসুলকে খোঁজে না। সেসব পরে শোনা যাবে, আগে বসুন, দু'এক ঢোক পেটে চালান দিন।

–উহু, বসার সময় নেই। তুমি আমার সাথে একটু বাইরে এসো।

–বেশ বড়সড় দাও মনে হচ্ছে।

–তা বলতে পারো।

–চলেন তাহলে। আগে কাজের কথাটা শুনে নেই! সিদ্দিক তোরা বস্।

বার থেকে বেরিয়ে দুটো সিগারেট কিনলো রাইসুল। আমাকে একটা দিলো। –চলেন, ঐ দিকে গিয়ে দাঁড়াই। এখানে ভীড়-ভাড় বেশী।

সোডিয়াম লাইটের রহস্যময় হলুদ আলোর নীচে দাঁড়ালাম দু'জন। জামা কাপড়ের রংটং সব বদলে গেছে, রাইসুলের লাল গেঞ্জিটাকে কালো কালো দেখাচ্ছে। আনমনে হাসলো ও।

–শহরটাকে কেমন ভৌতিক ভৌতিক লাগছে, তাই না?

–হুঁ! এই রকম রাস্তায় একাকী হাটতে গেলে আমার লোম খাড়া হয়ে আসে।

–তাই নাকি? আমার তো এমনিতেই সারাক্ষণ লোম খাড়া হয়ে থাকে। মনে হয় এই বুঝি কেউ এসে ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। বডডো বিপদের জীবন, সৈকত ভাই। ইদানিং খুব হাঁফিয়ে উঠেছি।

আমি একটু দমে গেলাম। শেষে কি খুনে রাইসুলকেও ন্যায়-অন্যায় বোধে পেলো? তাহলেতো বেশ ঝামেলাই হবে দেখছি। এই ধরনের ইতস্তত মন নিয়ে কাজকর্ম করা যায় না।

রাইসুল বোধ হয় কিছু টের পেলো। হাসতে হাসতে বললো--- কি ব্যাপার, ঘাবড়ে গেলেন নাকি? ঘাবড়াবার কিছু নেই। হঠাৎ এই লাইন ছেড়ে আপনাদের বিপদে ফেলবো না আমি। ছাড়াটা অতো সোজাও না। বুঝলেন কিনা পাপের সমুদ্রে আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছি। যাক ওসব কথা, আপনি কি জন্যে এসেছেন, তাই বলুন।

–সাজ্জাদ এবং দেলোয়ার আজাদ চৌধুরীকে ব্লাকমেইল করছে। ওদের দুজনার ব্যবস্থা করতে হবে তোমাকে।

–খতম?

–যদি ভয় খাইয়ে কাজ হয় তাহলে খুন-টুনের মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই।

–কতো পাওয়া যাবে।

–পঞ্চাশ। চলবে?

–চলবে।

–একটা অনুরোধ রাইসুল, নিতান্ত, বাধ্য না হলে খুন করো না।

রাইসুল আমার কাঁধে হাত রেখে টেনে টেনে হাসতে লাগলো। –আপনি খামাখা দুশ্চিন্তা করছেন। আমার কাজে কোনো ফাঁক থাকে না।

একটা বাংলা গানের কলি ভাজতে ভাজতে বারে ফিরে গেলো রাইসুল। আমি অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে আমার শরীরে চোখ বোলাতে লাগলাম। সব কিছুই কেমন অচেনা মনে হচ্ছে, এই জামা, প্যান্ট, জুতো, মায় শরীরের রংটাও। বেঁচে থাকাটাইতো রং বদলের খেলা, চেনা অচেনার খেলা। এই যে রাইসুল, ঘাড়ে হাত রেখে কতো ঘনিষ্ট বন্ধুর মতো কথা বললো, প্রয়োজন হলে আবার ওই নির্দ্বিধায় আমার পেটে গুলি চালিয়ে দেবে, ওর চোখের পাতাও কাঁপবে না। তখন আমি ওর অপরিচিত হয়ে যাবো, শত্রু হয়ে যাবো। তেমন কিছু ঘটা কি খুবই অসম্ভব? আমার কি অজস্র শত্রু নেই? একটি তীক্ষ্ণ আর্তনাদ আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, পালারে সৈকত, পালা, ও সৈকত .....।

পাবলিক বুথ থেকে মগবাজারের একটা নাম্বারে ডায়াল করলাম। বেল বেজে চলেছে, একবার, দুবার, তিনবার .... শালারা সব গেলো কোথায়? সটকে পড়লো নাতো? তাহলে ওদের কপালে খারাবি আছে, একেবারে জাহান্নামের আগুনে রোস্ট বানিয়ে তারিয়ে তারিয়ে খাবো। ওপার থেকে কেউ রিসিভার তুললো।

–হ্যালো, কে?

–সৈকত। এতো দেরী হলো কেন? কি করছিলে?

–টয়লেটে ছিলাম সৈকত ভাই।

–সাজ্জাদ কি করছে?

–শালা মাগী খুজতে গেছে। আমি অনেক মানা করলাম, শুনলো না।

–বুঝেছি, মরণপাখা গজিয়েছে ওর। একটু আগে রাইসুলের সাথে দেখা করেছি। হুঁশিয়ার হয়ে থেকো। বিপদ দেখলেই খবর দেবো। আর সাজ্জাদ ফিরে এলে বলো বেশী বিটলামি করলে রাইসুলকে ঠিকানাটা জানিয়ে দেবো।

–জ্বী, সৈকত ভাই। দোহাই আপনার। ওকে আমি ভালো করে বুঝিয়ে বলবো।

–বুঝলে ভালো, না বুঝলে খারাপ। একটা কথা মনে রেখো, বিপদ যা হওয়ার তোমাদেরই হবে, আমি বরাবরই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে যাবো। রাখি।

কিছু বলতে চেয়েছিলো দেলোয়ার, সুযোগ দিলাম না। ওদেরকে যতো বেশী কথা বলার সুযোগ দেবো ওরা ততো বেশী বেপরোয়া হয়ে উঠবে। অতোটা ঝুঁকি আমি নিতে পারি না।

দুই

চম্পা গেটে দাঁড়িয়েছিলো। আমাকে দেখে ছোট্ট করে হাসলো।

—এই সৈকত ভাই, এতো রাত পর্যন্ত কোথায় থাকেন বলেনতো?

—কতো কাজ আমার। কিন্তু তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন?

—আপনার জন্যেই।

—বলো কি! এই হতভাগার কাছে তোমার আবার কি দরকার পড়লো?

—ইস হতভাগা না ছাই। চলুন, আপনার ঘরে--- গিয়ে বসি। আপনার সাথে খুব জরুরী কথা আছে।

—চলিয়ে মেমসাব।

অন্য সময় হলে এই --- কথায় খুব হাসতো চম্পা। এখন একটু গম্ভীর হয়ে থাকলো। আমি অবাক হয়ে ওকে ভাল করে লক্ষ্য করলাম। ওর সুশ্রী গোলগাল মুখ খানিতে দুর্যোগের ঘনঘটা; দু'চোখে ঈষৎ বিষণ্নতা। চম্পার এই রূপ আমার অপরিচিত, সিরাজ সাহেবের কলেজ পড়ুয়া এই সুন্দরী মেয়েটিকে আমি কখনো গম্ভীর হয়ে থাকতে দেখিনি।

চম্পা হালকা গলায় বললো— এই সৈকত ভাই, ওভাবে কি দেখছেন?

—তোমার কি হয়েছে, চম্পা?

—ঘরে চলুন, বলছি।

বাসায় ঢুকেই দরজা আটকিয়ে দিলো চম্পা। ওর তটস্থ ভাবভঙ্গি দেখে আমি এবার বাস্তবিকই খুব ঘাবড়ে গেলাম। নির্ঘাত কোন ঝামেলা পাকিয়েছে এই মেয়ে।

—চম্পা, ঠিক করে বলো তোমার কি হয়েছে?

—সৈকত ভাই, আমাকে বাঁচান।

—কি হয়েছে?

—ফারুককে তো আপনি চেনেন, তাই না? ওর কথা আমি আপনাকে বলিনি?

—বলেছো। কি করেছে ফারুক?

—আমার সর্বনাশ করেছে, ফিস ফিসিয়ে উঠলো চম্পা।

–কি?

–বিশ্বাস করেন সৈকত ভাই, আমার কোন দোষ নেই। আমি ওসব করতে চাইনি। ওই আমাকে জোর করে .....।

–প্রেগন্যান্ট?

ওড়না দিয়ে মুখ ঢাকলো চম্পা, অবরুদ্ধ কান্নায় ওর শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। প্রচ- ক্রোধ আমাকে গ্রাস করতে শুরু করলো। এই সব কি ধরণের পাগলামি, হ্যাঁ? তুই কি মাধুরী, তুই কি সাঈদা, সমাজের ট্যারা চোখ যদি সহ্য করতে না পারিস, তাহলে গেছিলি কেন পীরিত মারাতে? ভদ্দর লোকের মতো বেঁচে থাকতে আর ভাল্লাগছে না, না? শুধু নোংরা ঘাটতে ইচ্ছে করে, কুকুরের মতো ডাস্টবিনে মুখ থুবড়ে পড়তে ইচ্ছে করে? উহ, অসহ্য। এতো কাল ওদের বিশুদ্ধতা দেখেছি আর নিজেকে অভিশাপ দিয়েছি, নর্দমার পাঁকে শরীর ডুবিয়ে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে স্বর্ণালী সেই সব দৃশ্য দেখেছি, তার মধ্যে এক ধরনের তৃপ্তি ছিলো, আনন্দ ছিলো। কি নোংরা। কি নোংরা! সৈকত, ও সৈকত, তোর কোন দোষ নাইরে---।

চম্পা ফুঁপিয়ে উঠলো--- সৈকত ভাই, আপনি আমাকে এই বিপদ থেকে বাঁচান, নইলে আমি আত্মহত্যা করবো।

–ফারুক কোথায়?

–পালিয়েছে।

–কোথায় গেছে জান?

–না, আমাকে কিছু বলে যায়নি। কাপুরুষ একটা।

–বাসায় কেউ কিছু জানে?

–নাহ।

–দুশ্চিন্তা করো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি চম্পার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম। ওর জন্য আমার মায়া হতে লাগলো। অল্প বয়সী একটা মেয়ে, এই পৃথিবীর কটা ব্যাপারই বা ও জানে? ওকে অযথা দোষ দিয়ে কি লাভ?

–চম্পা, কেঁদো না। আমার চেনাজানা একটা মেয়ে আছে, সে এসব ব্যাপারে অনেক কিছু জানে। কাল সন্ধ্যায় তার কাছে নিয়ে যাবো তোমাকে। দেখো, সব আবার আগের মতো হয়ে যাবে।

চম্পা আমার বুকে মাথা গুঁজে সশব্দে কাঁদতে লাগলো। --- আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে, সৈকত ভাই।

–বোকা মেয়ে, এতো তাড়াতাড়ি মরলে চলবে কেন? এই পৃথিবীকে এখনও অনেক কিছু দেয়ার আছে তোমার। সব মানুষের জীবনেই তো ব্যথা থাকে, বেদনা থাকে। তারা সেই ব্যথা-বেদনার সাথে সারা জীবন লড়তে লড়তে বেঁচে থাকে, এটাইতো জীবন।

চম্পা কিছু শুনছে কিনা বুঝতে পারলাম না, ও আমাকে আরো শক্তভাবে জাপটে ধরে কাঁদতে থাকলো। আমি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়লাম। আসলে জীবনটা কি?

○ ○ ○ ○ ○

বাসাবো এলাকাটা সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা ছিলো না। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সব দিকেই তার বিস্তার, বাড়ীগুলোর নাম্বারের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই, এই আছি এই নাই অবস্থা। তবুও ছোটখাটো একতালা বাড়ীটা ঠিকই খুঁজে বের করে ফেল্লাম। ভাঙ্গাচোরা গেট-পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই একটু আঙ্গিনা, সেখানে কারো সযত্ন হাতের ছোঁয়ায় গড়ে উঠেছে ফুলের বাগান। ছোট্ট কিন্তু পরিপাটি। কয়েক রকমের গোলাপ, কয়েকটা রজনীগন্ধা, খান দুই গন্ধরাজ, বাকীগুলো অচেনা। বাসার ভেতর থেকে দু'টি মেয়ের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে বেশ বোঝা যাচ্ছে-তুমুল ঝগড়া চলছে। দরজায় কোন কলিংবেল নেই, টোকা দেবো কি দেবো না ভাবছি এমন সময় বাচ্চা মেয়েটা গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলো। পরনে স্কুল ড্রেস, সরু লিকলিকে দুটো বেণী, বড় বড় চোখ, হাতে আইসক্রীম।

–এই, তুমি কে?

–আমার নাম সৈকত। তোমার নাম কি?

–আমার নাম সাথী, ভালো নাম না?

–খুব ভালো নাম। কোন স্কুলে পড় তুমি?

–ঐ তো ঐ স্কুলটাতে। আঙ্গুল উঁচিয়ে দুরের কতকগুলো দালান দেখিয়ে দিলো মেয়েটা। --- কোন্ ক্লাসে পড়ি শুনবে না?

–নিশ্চয়, কোন্ ক্লাসে পড় তুমি?

–টুতে।

–তাই নাকি। আমি তো ভেবেছিলাম নার্সারীতে পড়ো।

মেয়েটা কলকলিয়ে হেসে উঠলো। –তুমি খুব বোকাতো। আমি কতো বড় মেয়ে, আমি কেন নার্সারীতে পড়বো। আইসক্রীম খাবে?

–নাহ, আমি তো আইসক্রীম খাই না।

–আইসক্রীম খাবে না! তাহলে কি চাও তুমি?

–আমি তোমার আম্মুর সাথে দেখা করতে এসেছি।

–তাই বলো। সাথী দরজা ধাক্কা দিলো।

–এই বিথী আপা, বিথী আপা, দরজা খোলো না ভাই, ও বিথী আপা .....।

মিষ্টি দর্শন কালো মতন একটি মেয়ে বিরক্ত মুখে দরজা খুললো। আমাকে দেখে তার বিরক্তি আরো বাড়লো।

–কি ব্যাপার, কাকে চান?

আমার মেজাজটা একটু খারাপ হলো, না হয় চেহারাটেহারা সুবিধার নয় তাই বলে দেখা মাত্রই কপালে তিনখানা ভাঁজ ফুটিয়ে ফেলতে হবে? মেয়েটা নিজেকে ভাবে কি?

গম্ভীর স্বরে বললাম –আমার নাম সৈকত, সিরাজ সাহেব আমাকে পাঠিয়েছেন।

মেয়েটার মুখ থেকে বিরক্তির চিহ্ন মুছলো না। --- ও, ভেতরে আসুন। আমাদের বাসায় কোন সোফাটোফা নেই। ঐ খাটটাতে বসুন। আমি মাকে ডেকে দিচ্ছি। সাথী, তুই আমার সাথে আয়।

–কেন, আমি ওর সাথে একটু গল্প করি না।

–না, তোমাকে আর ডেঁপোমি করতে হবে না। আয় আমার সাথে!

–আসছি বাবা, আসছি। অতো রাগ দেখাচ্ছো কেন?

অনেক কষ্টে হাসি চাপলাম। ছোট ছোট মেয়েরা এতো চমৎকার ভঙ্গি করে কথা বলতে পারে জানতাম না। বুকের ভেতর কোথায় যেন ব্যথার মোচড় অনুভব করলাম। বয়সতো কম হলো না। এই বয়সে নিজের করে কিছু পেতে খুব ইচ্ছে করে। ছোট্ট কোন মেয়েকে কোলে নিয়ে তার লিকলিকে বেণী দুখানি দুলিয়ে দিয়ে বলতে ইচ্ছে করে– মামনি আজ আমরা কোথায় বেড়াতে যাবো বলতো?

ঘোমটা দেয়া রোগা মতন মহিলাটিকে দেখেই উঠে দাঁড়ালাম। তার মুখে অনেক যন্ত্রণার ছাপ, বয়েস বোঝা গেলো না। তিনি নীচুস্বরে বলেন-আপনার নাম কি বাবা?

–জ্বি, সৈকত। সিরাজ সাহেব আমাকে বললেন।

–দাঁড়িয়ে থাকবেন না, বসুন। আমি সব জানি। দেখতেই তো পাচ্ছেন, বড় ছোট বাসা। এটা বাদে ভেতরে আর মাত্র দুটো কামরা। থাকতে হলে আপনাকে এই ঘরেই থাকতে হবে। টাকা পয়সা নিয়ে আমি কিছু বলব না। আপনি সুবিধামত দেবেন। তবে বাবা, আমার একটা অনুরোধ আছে--।

–বলুন না খালাম্মা। আমি তো আপনার ছেলের বয়েসী, আমার কাছে লজ্জা করার কি আছে?

–দয়া করে বাসায় কোন বন্ধু-বান্ধব আনবেন না। আমার মেয়েদের কারোরই বিয়ে হয়নি, বোঝেনইতো নানাজনে নানান কথা বলবে।

–খালাম্মা, আপনি অযথা দুঃশ্চিন্তা করছেন। আমার তেমন কোন বন্ধু-টন্ধু নেই, আমি খুব নিঃসঙ্গ মানুষ।

সেই কালো মতন মেয়েটি এক কাপ চা নিয়ে ভেতরে ঢুকলো। সহজ ভাবে বললো- সৈকত ভাই, বাসায় বিস্কুট-টিস্কুট কিছু নেই। শুধু চাই খেতে হবে।

–চা না হলেও চলতো।

–দিয়েছি যখন তখন খেয়ে নিন।

খালাম্মা মৃদু হেসে বললেন---আমার মেঝ মেয়ে বিথী। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। ওর কথাবার্তা ঐ রকমই, আপনি যেন কিছু মনে করবেন না, বাবা।

বিথীর কপালে আবারো ভাঁজ দেখা দিলো। --- তুমি কি বলতো মা? ওকে আবার আপনি-আপনি করছো কেন? বড় ভাইয়ার চেয়ে ওর বয়েস তো কমই হবে।

–জ্বি খালাম্মা আমাকে আপনি তুমি করেই বলবেন। আমি মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। সন্দেহ নেই এই বাসায় থাকলে ঐ মেয়েটার সাথে আমাকে কোমর বেঁধে দিনে তিনবার তুমুল ঝগড়া করতে হবে।

খালাম্মা ডাকলো ---ইতি, এই ইতি, এ ঘরে একটু আয়রে মা।

–কেন? পর্দার ওধার থেকে সুরেলা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

–আয় না মা, অতো কেন কেন করছিস কেন?

ইতি এলো না। খালাম্মা অপ্রতিভ মুখে বললেন, 'আমার বড় মেয়েটা কিন্ডারগার্টেন স্কুলে পড়ায়। সে এখন বাসায় নেই। তা বাবা, তুমি আসছো কবে?

–জ্বী, কাল পরশুর মধ্যে চলে আসবো। আজ তবে উঠি, খালাম্মা।

–চা টাতো খেলে না।

–ঠা-া হয়ে গেছে। আরেক দিন খাবো।

উনি হাসতে লাগলেন।--- তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে, বাবা। তুমি কালই চলে এসো।

–জ্বী দেখি।

গেটের সামনে গিয়ে আনমনে ঘুরে তাকালাম। জানালার ও ধারে সুন্দর মুখটা দেখা গেলো, দুই বুড়ো আঙ্গুল উঠিয়ে সুদীর্ঘ একখানি ভেঙ্গচি কাটলো সে। আমিও আধ হাত জিভ দেখিয়ে দিলাম।

○ ○ ○ ○ ○

টেবিলে পা তুলে চেয়ার হেলান দিয়ে বিধ্বস্ত ভঙ্গিতে বসে ছিলো আজাদ, আমাকে দেখেই তড়াক করে খাড়া হলো। রক্ত জবার মতো লাল চোখ তুলে আমাকে পরখ করলো।

–কি খবর সৈকত? কোন ব্যবস্থা হলো? বুঝলে গত রাতে আমার এক ফোঁটা ঘুম হয়নি। ঘাড়ের উপর খাড়া ঝুলিয়ে কি ঘুমান যায়। তা কত দূর কি হলো?

–মি: আজাদ, অবস্থা খুব সুবিধার না।

–সে কি? সাজ্জাদদের খোঁজ পাওনি? রাইসুল বেঁকে বসেছে? প্লিজ আর রহস্য করো না। কি হয়েছে খুলে বলো।

আমি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়লাম। ---রাইসুলকে নিয়ে কোন সমস্যা নেই। টাকাটা অবশ্য একটু বেশীই হেকেছেও। আশি হাজারের নীচে আঙ্গুল নাড়াতেও রাজি না। আমি অবশ্য বলে এসেছি টাকা-পয়সা কোন সমস্যাই না। কিন্তু ঝামেলা হয়েছে অন্যখানে.....।

আড় চোখে তাকিয়ে দেখলাম, গভীর মনোযোগে আমার প্রতিটি কথা গিলছে আজাদ। ভালো, এটাইতো টোপ গিলবার লক্ষণ।

–হুঁ বলো, থামলে কেন? কি ঝামেলা হয়েছে?

–সাজ্জাদ আর দেলোয়ারের কোন খবরই পাওয়া যাচ্ছেনা; ওরা দু'জন যেন একেবারে বাতাসে মিলিয়ে গেছে। সন্দেহ হচ্ছে, কোন প্রভাবশালী মহলের ব্যাকিং পাচ্ছে ওরা।

আজাদ ভোঁস করে বিশাল এক নিশ্বাস ছেড়ে টেবিলের উপরেই বসে পড়লো।---এখন কি হবে তা হলে? রাইসুল কি বলে?

—ও সময় চেয়েছে নিদেন পক্ষে সপ্তাহ দুই। বোঝেনই তো ওকেতো সমানভাবে সাবধান থাকতে হয়। গরম মাথায় ঝট করে একটা কাজ করে বসলেই চলে না।

—দু-সপ্তাহ!

—উপায় নেই, ব্যাপারটা গুরুতর, একটু রয়ে সয়ে এগুনোই ভালো।

—আরে রাখো তোমার রয়ে সয়ে, আমার দশ লাখ টাকা গচ্ছা যাচ্ছে, আর তুমি আছো ইয়ে নিয়ে।

—দেখুন স্যার, এখন মাথা গরম করার সময় নয়। একটু চিন্তা করে দেখুন, তাড়াহুড়া করে কিছু করতে গেলেই সাজ্জাদরা সতর্ক হয়ে যাবে, ক্ষেপে গিয়ে টাকার মায়াও ভুলে যেতে পারে ওরা। সে ক্ষেত্রে আপনি ভীষণ বিপদে পড়ে যাবেন।

—সবইতো বুঝতে পারছি সৈকত। কিন্তু শালাদের হাঁকটা একবার শোন, দশ লাখ, চিন্তা করতে পারো? ও দুইটাকে হাতের কাছে পেলে আমি এখন কাঁচা চিবিয়ে খেতাম, তোদের বাপের জন্মে দশ লাখ টাকা দেখেছিস তোরা?

ওদের কথা জানিনা, তবে আমি দেখিনি। কিন্তু দেখার ইচ্ছেটা ষোলআনা। হাজার কোটি কোটি টাকার কচকচানি শুনি, থাকে কোথায় এতো টাকা! এবার আর ছাড়ছি না, টাকা আমার চাই-ই চাই। কোটি কোটির দরকার নেই, লাখ খানেক হলেই চলবে।

—আমি বলি কি, এ ব্যাপারে ওদের সাথে একটা সমঝোতায় আসার চেষ্টা করুন। অন্তত পক্ষে ওরা যেন ঘুর্ণাক্ষরেও বুঝতে না পারে যে ওদের পেছনে আমরা খুনে লেলিয়ে দিয়েছি।

— বলো কি তুমি? দশ লাখ টাকা ওদেরকে দিয়ে দেবো?

—আপাতত এ ছাড়া অন্য কোন উপায় তো দেখছিনা। অবশ্য আপনার এত দুশ্চিন্তার কিছু নেই। ঐ টাকা নিয়ে সাজ্জাদরা আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে সটকে পড়তে পারবে না। ধরা ওদেরকে পড়তেই হবে। ইতিমধ্যে আর যোগাযোগ করেছে ওরা?

—হ্যাঁ, আজ সকালেই। দু'দিনের মধ্যে টাকা না দিলে প্রমাণগুলো পুলিশের হাতে দিয়ে দেবে।

—কোথায় পৌঁছে দিতে হবে টাকাটা?

–সে সব কিছু বলেনি। আজ সন্ধ্যায় আবার ফোন করবে। তখন বলবে।

আমি উঠে পড়লাম। –আমার বুদ্ধিতো শুনলেন না স্যার। এবার নিজে চিন্তা ভাবনা করে দেখুন, কি করবেন। আমি কাল একবার আসবো।

আজাদ চিন্তিত মুখে পায়চারি করতে লাগলো। –ঠিক আছে কাল দশটা-এগারটার দিকে এসো। আমি আর একটু ভেবে দেখি।

হৃষ্ঠ চিত্তে ওর অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম। খোদা এইবারটি একটু সাহায্য করিস, কিরে কেটে বলছি আর না। সব ঠিকঠাক মত মিটে গেলে চার-পাঁচ লাখ টাকা হাতে আসবে, নিজেই একটা ব্যবসা ফাঁদতে পারবো, পরের পা চেটে চেটে আর পিতৃদত্ত জিভটার বারোটা বাজাতে হবে না। দয়া করিস্ মাওলা, রহম করিস্।

○ ○ ○ ○ ○

বাংলাদেশ ব্যাংকের সিঁড়িতে গুঠিসুটি হয়ে বসেছিল চম্পা। হালকা সবুজ রংয়ের সালোয়ার কামিজ পরেছে, পিঠময় ছড়ানো কোঁকড়া চুলের রাশি, কেমন যেন এক ধরণের ভয়ার্ত উদাসীনতা ঘিরে আছে মেয়েটাকে। দূর থেকে দৃশ্যটা দেখেই মন খারাপ হয়ে গেলো। প্রাণোচ্ছল মেয়েটা ক'দিনেই কেমন কাবু হয়ে গেছে। ওর কিছু হয়ে গেলে, ফারুক না কে, সেটাকে আমি ছাড়বো না।

আমি চম্পার একেবারে পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম, ও আমাকে লক্ষ্যই করলো না। --- চম্পা।

ভয়ানকভাবে চমকালো। --- ও, সৈকত ভাই। এতো দেরী করলেন, আমি তো ভাবছিলাম বোধ হয় ভুলেই গেছেন।

–বোকা মেয়ে। এমন একটা ব্যাপার ভোলা যায়? ওঠো। তুমি খুব ঘাবড়ে গেছো দেখতে পাচ্ছি। এতো ভয়ের কিছু নেই, আজকাল এসব ব্যাপার কোন ঘটনাই না। অহরহ হচ্ছে।

–কই আমি ভয় পাচ্ছি নাতো!

–তাহলে তোমাকে এমন উদাস উদাস দেখাচ্ছে কেন?

–বোধ হয় কবি টবি হয়ে যাচ্ছি। হাসার চেষ্টা করলো ও। ওর চোখের কোণে টলমলে অশ্রু দেখলাম।

–এই মেয়ে, খবরদার কাঁদবে না বলছি। এই সব কান্নাটান্না আমার একদম সহ্য হয় না। কেঁদে কেটে কখনো কোন ফায়দা হয় না কি?

–যাহ, কাঁদবো কেন? আমি কখনো কাঁদি না।

–লক্ষী মেয়ে। এই রিক্সা।

পুরানো পলটনে মাধুরীর বাসায় গেলাম। সবে ঘুম থেকে উঠেছে, চোখ মুখ এখনও ফোলা। আমার সাথে কমবয়সী একটা মেয়েকে দেখে দু'চোখ কপালে তুলে ফেললো।

–ও প্রানেশ্বর, এটাকে আবার কোথেকে জোটালে গো?

–মাধুরী, কোন ইয়ার্কি নয়। ঘটনা গুরুতর।

–হা প্রানেশ্বর, শেষে এই ছিলো তোমার মনে? আমার এতো রূপ যৌবন সেসব তোমার চোখেই পড়লো না। কোথাকার কোন এক পুঁচকে ছুড়ি..... ।

–মাধুরী, লাষ্ট ওয়ার্নিং।

–ঠিক আছে বাবা। ঠিক আছে। গুরুতর ঘটনাটা বয়ান কর।

–মেয়েটা প্রেগন্যান্ট হয়ে গেছে। খসাতে চায়।

–ওমা! তুমি এতো কাঁচা কাজ করো জানতাম না তো।

–আরে গাধা। আমি না। আমি হলে কষ্ট করে তোমার কাছে আসতাম না। কাজীর দরবারে যেতাম।

–সে আমি জানি গো। তোমার যতো আপত্তি শুধু আমার বেলাতেই। এই মেয়ে। সত্যি করে বলো এই হাল ও করেছে, ঠিক কিনা?

চম্পা লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। --- জ্বি না। ফারুক করেছে। আমার ফিঁয়াসে।

–মিথ্যে করে বলছো নাতো?

–নাতো। মিথ্যে বলবো কেন? ফারুক একদিন ওদের মীরপুরের ফাঁকা বাসায় নিয়ে গেলো আমাকে, তারপর ..... ।

–কি জ্বালা বল দেখিনি। আমি কি তোমার কাছে ওসব কেচ্ছা শুনতে চেয়েছি। তা নাম কি তোমার?

–চম্পা।

–তোমার সাথে এই ঝুট ঝামেলার পরিচয় হলো কি করে?

—মাধুরী, তুমি বডডো বাড়াবাড়ি করছো। কোথায় একটা ব্যবস্থা-ট্যবস্থা করবে তা না জেরা করতে লেগেছো।

—অতো ধমকিও নাতো, বাবা। আমি কি ব্যবস্থা করবো। আমি কি ডাক্তার?

চম্পা হতাশ ভঙ্গিতে বললো —আপনি ডাক্তার নন?

—ওমা, ওকি তোমাকে তাই বলেছে?

—না তো। কিন্তু আমি ভাবলাম .....।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। ---চম্পা তুমি এখানে চুপচাপ একটু বসো। মাধুরী, ভেতরে চলো তো।

মাধুরী একগাল হেসে বললো-কেন গো, এই অসময়ে আবার ভেতরে কেন?

আমি ওর হাত চেপে ধরে এক রকম টানতে টানতেই ড্রয়িং রুমের বাইরে নিয়ে এলাম।

—মাধুরী, মেয়েটা ভীষণ নার্ভাস হয়ে আছে। আত্মহত্যার কথাও বলছিলো। ওর সামনে আলতু-ফালতু কথা না বলে ওকে নিয়ে এক্ষুনি তোমার সেই পরিচিত ডাক্তারের কাছে চলে যাও। দেখো কেউ যেন ওর পরিচয় জানতে না পারে।

—কেন জানলে কি হবে?

—ন্যাকামি করো না। ভদ্রলোকের মেয়ে, এই ঘটনা ফাঁস হয়ে গেলে ওর জীবনটা ছারখার হয়ে যাবে, বুঝতে পারছো না?

মাধুরী মুখ-টুখ ফুলিয়ে বললো। --- সবতো বুঝলাম।এবার চুক করে ঠোটের এদিকটাতে একটা .....।

আমাকে চড় তুলতে দেখেই ঝট করে সরে গেলো।--- একটা কাজইতো পারো।

—যাচ্ছো তো?

—না গিয়ে উপায় আছে? প্রাণেশ্বর নিজে এসে যখন বলছে---তা মেয়েটা কে?

—আমার বাড়ীওয়ালার ছোট মেয়ে।

—আজকালকার মেয়েরাতো খুব চালাক হয়। এটা এমন বোকা

কেন?

—সবাই চালাক হয় না। কেউ কেউ বোকাও থাকে। তোমাকে যা বললাম তাই করো; আমি বিকেলের দিকে এসে ওকে নিয়ে যাবো।

—এখন কোথায় যাচ্ছো?

—কাজ আছে।

—সাজ্জাদদের খোঁজ পেয়েছো?

—ওসব ব্যাপারে তোমার এতো মাথা না ঘামালেও চলবে।

আমি ড্রয়িংরুমে ঢুকতেই চম্পা উঠে দাঁড়ালা। ---সৈকত ভাই। আপনি আমাকে এখানে কেন এনেছেন? উনি তো ডাক্তার নন।

—ভয় পেওনা চম্পা। আমি তোমার কোন ক্ষতি করবো না। ওর নাম মাধুরী। আমার খুব ঘনিষ্ট বান্ধবী। ওর চেনা জানা একজন বিশ্বস্ত ডাক্তার আছেন। ও তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাবে।

চম্পা আমার হাত চেপে ধরলো। ---না সৈকত ভাই আপনি না গেলে আমি কোথাও যাবো না।

—চম্পা। ছেলেমানুষি করো না। মাধুরীকে দেখে যাই মনে হোক। ও আসলে খুব ভালো মেয়ে।

—না, সৈকত ভাই। আপনি আমাকে বাসায় নিয়ে চলুন।

মাধুরী হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো। ---এই পাজী মেয়ে, ভালো করে আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখোতো। কি, আমাকে দেখে কি সিনেমার ভিলেন মনে হচ্ছে? বোকা কোথাকার, আমি তো তোমার মতই মেয়ে। তোমার কষ্ট আমি বুঝিনা ভেবেছো? চলো, আমরা ভেতরের ঘরে বসে অনেক সুখ দুঃখের আলাপ করবো। এসো।

চম্পা আমার দিকে তাকালো। আমি মৃদু হেসে ওর কাধটা চাপড়ে দিলাম। --- যাও। কোন ভয় নেই।

মাধুরীর বাসা থেকে বেরিয়েই লম্বা করে একটা শ্বাস নিলাম, বুকের ভেতরের কষ্টের বোঝাটা যেন হঠাৎ হালকা হয়ে গেলো। বড় দুঃসময় এখন। বড় যন্ত্রণার সময়। কি হবেরে সৈকত, অ-সৈকত..... কে জানে কি হবে? আমি কিছু জানিটানি না।

○ ○ ○ ○ ○

চারদিকে থরে থরে সাজানো সিমেন্টের ব্যাগের মাঝে মাঝারী সাইজের একখানা টেবিল আর খান চারেক চেয়ার নিয়ে সিরাজ সাহেবের দোকান। ব্যস্তভঙ্গিতে রসিদ লিখছিলেন ভদ্রলোক।

আমাকে দেখে মৃদু হাসলেন।

–কি ব্যাপার সৈকত সাহেব, হঠাৎ এদিকে যে। কোন কাজে এসেছেন না এমনিই ঘুরতে ঘুরতে।

–জ্বি না। কাজ টাজ কিছু নেই, এমনি---।

–হা, হা, ইয়াং বাবুদের এই এক সমস্যা। মনটা সব সময় উড়ু উড়ু করে। বসেন বাবা বসেন। আমি হাতের কাজটা সেরে নেই। ওরে সামাইদ্যা, একখানা কোক লইয়া আয়, যলদি যা!

–জ্বিনা, ও সব কিছু লাগবে না।

–না বাবা, ও কথা বললেতো চলবে না। আমার দোকানে এলে আমি কাউকে খালি মুখে যেতে দেই না।

তিনি আবার হাতের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

আমি খানিকটা নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে বাদামতলী ঘাটের ব্যস্ততা দেখতে লাগলাম। মানুষে সয়লাব, কালো কালো শক্ত সমর্থ শরীর, পেশীর পাকে পাকে বুনো শক্তির স্ফুরণ। হাঁক, ডাক, তীক্ষ্ণ কণ্ঠের চীৎকার, দূরে জাহাজের ভেঁপু বাজছে, ভূ-উ-উ-ম্ ভূ-উ-উ-ম। হ-য-ব-র-ল কা-। কেন এমন এখানে? কি জানি। মানুষের সব কাজেরই কি যুক্তিযুক্ত কারণ থাকে? সামাদ নামের সরু লম্বা ছেলেটা আমার হাতে একটা কোকের বোতল ধরিয়ে দিয়েই নিজের কাজে চলে গেলো। যাশ্ শালা, বিনে পয়সার মাল উদরমে ঢাল, ঢক্ঢক্ করে বোতল খালি করে ফেললাম।

সিরাজ সাহেবের কাজ শেষ হয়েছে। তিনি উঠে দাঁড়ালেন।---চলেন, বাবা, নদীর ধারে কোথাও গিয়ে দাঁড়াই। এতো হুজ্জতের মধ্যে কথাবার্তা বলা যায় না।

–সিরাজ সাহেব, আজ সকালে ওদের বাসায় গিয়েছিলাম।

–খুব ভালো করেছেন। কেমন লাগলো ওদের সব?

–ভালো।

–যাচ্ছেন কবে?

–ভাবছি কালই চলে যাবো।

—যান কালই চলে যান। ওখানে আপনার কোন অযত্ন হবে না। তবে একটা কথা বাবা, কোন ফ্যামিলিতে থাকলে সেই ফ্যামিলির সবার উপরেই একটা দায়িত্ব গড়ে উঠে। সেটুকু পালন করাই পারিবারিক জীবনের সবচেয়ে বড় শর্ত। আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন তো বাবা?

—পারছি। আপনি চিন্তা করবেন না। ওদের জন্য যতোটা সম্ভব আমি করবো।

—আর একটা কথা বাবা, আপনার সাথে যখন এভাবে দেখা হয়েই গেলো তখন সব খুলেই বলি। ওদের আত্মসম্মান বোধ খুব বেশী। ভাবীর সাথে নিশ্চয় আপনার দেখা হয়েছে। তাকে দেখে খুবই সহজ-সরল মনে হয়, কিন্তু নিজের সম্মানটা সে খুব ভালো বোঝে। কখনো এমন কিছু করবেন না যেটা ওদের চোখে অপমানজনক মনে হয়। বুঝলেন কি না বাবা, আমি নিজেই দু-একবার টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে চেয়েছি সে নেয়নি, সে ভিক্ষে নেবে না। আপনার ব্যাপারটা অন্য রকম, তাই রাজী হয়েছে। যাক সে সব। আমার আরেকটা কথা আপনাকে রাখতেই হবে বাবা! আমি মাঝে মাঝে কিছু টাকা পয়সা দেবো, আপনি সেগুলো আপনার বলে চালিয়ে দেবেন। কি বাবা, পারবেন না?

আমি একটা সিগারেট ধরালাম। নদীর পানিতে কড়াসূর্যের আলো ঝিলমিল প্রতিবিম্ব, ঢেউয়ের মতো এধার ওধার দুলছে, তাকিয়ে থাকলে চোখ ঝলসে যায়।

—সিরাজ সাহেব।

—বলুন, বাবা।

—এর মধ্যে অন্য কোন রহস্য আছে, ঠিক না?

সিরাজ সাহেব দীর্ঘক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন,--না বাবা এর মধ্যে আর কিছু নেই, আপনি কি এখনই চলে যাবেন? আমাকে আবার দোকানে যেতে হবে।

—সিরাজ সাহেব, আপনার ছোট মেয়েটা খুবই সহজ সরল, ওর উপর নজর রাখবেন।

—চম্পার কথা বলছেন?

—জ্বি, দুনিয়াটা খারাপ, সহজ-সরল মানুষদের সবাই ঠকায়।

—আপনি ঠিকই বলেছেন বাবা। আমার এই মেয়েটা বডডো ছেলেমানুষ; তবে ভাববেন না বাবা, আমি ওর বিয়ে ঠিক করছি।

—করুন, তাই করুন। বিয়ের পর হয়তো ওর ছেলেমানুষি কেটে যাবে। যাই সিরাজ সাহেব।

–আসুন বাবা ।

মোড় ঘোরার আগে অনেক ইয়ে করেই পেছন ফিরে চাইলাম । সিরাজ সাহেব সেখানেই দাঁড়িয়ে আছেন, আমার সাথে চোখাচোখি হতেই মাথা ঘুরিয়ে নিলেন ।

○ ○ ○ ○ ○

গুলিস্থানের মোড়ে বিথীর সাথে দেখা হলো । অজস্র মানুষের ভীড়েও কালো মতন মেয়েটি উজ্জল নক্ষত্রের মতো জ্বলছিলো ।

আমি রিক্সা থামালাম ।

–বিথী, এই বিথী .....

বিথী বিরক্ত চোখে তাকালো । ---কি ব্যাপার আপনি কোথায়?

–বাদামতলী গিয়েছিলাম । তুমি এদিকে কোথায় এসেছিলে?

–সেটা আপনাকে বলতে হবে নাকি?

–না, দরকার নেই । এখন কোথায় যাবে সেটাতো বলা যায়, নাকি?

–বাসায় । কিন্তু রিক্সা পাচ্ছিনা ।

–উঠে পড়ো । তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি ।

–থাক, আপনাকে আর দয়া দেখাতে হবে না । আমি একাই যেতে পারবো ।

আমি রিক্সা ছেড়ে দিলাম । বিথী অবাক চোখে তাকালো ।

–কি হলো, রিক্সা ছাড়লেন কেন?

–আমার খুশী ।

বিথীর ঠোঁটের ডগায় মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো ।

–আপনি তো বেশ পাগল আছেন!

–তুমিও কম পাগল না?

–এই সৈকত ভাই, একদম বাজে কথা বলবেন না । আমি কি আপনাকে রিক্সা ছাড়তে বলেছিলাম?

–আমি মোটেই তা বলিনি ।

বিথী ওড়না দিয়ে ঘাম মুছলো। ---থাকগে এখন আর ঝগড়া ঝাটি করে কাজ নেই। কি করে বাসায় যাওয়া যায় তার একটা উপায় বের করুন।

—তুমি একটু দাঁড়াও। আমি একটা রিক্সা ম্যানেজ করছি।

—পারবেন না। এখন রিক্সা ফেরত দেবার সময়। কেউ বেশী দূরে যেতে চায় না।

—আমি ঠিকই পারবো। আমাকে তুমি চেনো না।

তিন মিনিটের মাথায় বাসাবো এলাকার এক রিক্সায়ালাকে পেয়ে গেলাম। আমি বিথীর দিকে তাকিয়ে আত্মতৃপ্তির হাসি দিলাম। মেয়েটা মোটেই পাত্তা দিলো না, বিরক্ত মুখে রিক্সায় উঠতে উঠতে বললো —আপনার কপাল ভালো!

ঝিং---মিং শব্দ তুলে রিক্সার অরণ্যে হারিয়ে গেলো বিথী। আমি অবাক হয়ে সে দিকে তাকিয়ে থাকলাম। এই মেয়ের কাছে জয় পরাজয়ের বিভেদটা খুব তীব্র, ও চায়নি আমি এতো তাড়াতাড়ি রিক্সাটা পেয়ে যাই। কতো কিসিমের মানুষ আছে এই দুনিয়ায়।

তিন

মগবাজার রেল গেইট পেরিয়ে বাঁয়ের অপরিসর গলিতে ঢুকলাম। সিগারেট কেনার বাহানায় পেছনটা ভালো করে জরিপ করে নিলাম। আমার পিছু লাগার কারো কোন কারণ নেই, তবুও সাবধান থাকা ভালো।

তেতালা বাড়ীটার সামনে এসে আরেকবার দ্রুত চারদিকে চোখ বোলালাম। সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়লো না। প্রায় পিছলে গেট পেরিয়ে ভেতরের সিঁড়ি ঘরে ঢুকলাম। সিঁড়িগুলো খুব উঁচু উঁচু, তিন তলায় উঠতে রীতিমতো হাঁফ ধরে গেলো। ফ্লাটটাতে সুমসাম নীরবতা। সাজ্জাদরা নেই নাকি?

অস্পষ্টভাবে পরপর তিনটে টোকা দিলাম। কোন সাড়া শব্দ নেই। আবার তিন টোকা। আস্তে করে দরজায় ধাক্কা দিতেই হাট হয়ে খুলে গেলো পাল্লা দুটো। এ কি কা-! ভেতরে ঢুকে দ্রুত সব কটি ঘরে খোঁজ করলাম, কেউ নেই। আতংকের একটা স্রোত বয়ে গেলো শরীরে। তবে কি সাজ্জাদরা সরে পড়েছে? শেষ পর্যন্ত আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো! নাকি রাইসুলকে দেখে সটকে পড়েছে? অসম্ভব নয়। আমার হৃদকম্প অত্যন্ত বেড়ে গেলো। রাইসুলকে আমি ভয় পাই, নিদারুণ ভয় পাই। ওর কোন বিবেক নেই, আপন পর ভেদাভেদ নেই। সামান্য বিশ্বাসভঙ্গের চিহ্ন

দেখলেই নির্বিবাদে খুন করবে ও। জানালার পর্দা সরিয়ে গলির এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলাম। রাইসুল কোথাও ঘাপটি মেরে বসে নেই তো, হয়তো নেই। স্রেফ চোখের দেখায় ওর উপস্থিতি বোঝা যাবে না। সেজন্যে চাই সজাগ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। আমার সব কটা ইন্দ্রিয়ই কম বেশী ভোঁতা, আমি ইহকালেও ধরতে পারবো না, রাইসুল আছে কি নেই।

বড় সমস্যায় পড়া গেছে। চারপাশে চক্কর মেরে দেখলাম, বেরুনোর আর কোন পথ নেই। মরি আর বাঁচি যে পথে ঢুকেছি সেই পথেই বের হতে হবে। তাহলে আর বসে থেকে কি লাভ? চল শালা কপালে যা আছে তাই হবে। প্রায় স্বাভাবিকভাবেই সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচে নেমে এলাম, লম্বা লম্বা পায়ে গলি বেয়ে হাঁটছি। বুকের ভেতরটা টিপ টিপ করছে, তা করুক। ভোঁ দৌড় দিয়ে পগার পার হতে ইচ্ছে করছে, অসম্ভব। আমাকে এমনি ভাবে ভালো মানুষের মতো হেঁটে যেতে হবে, বাঁচার এই একটাই উপায়-যদি রাইসুল আশে পাশে থেকে থাকে।

সন্ধ্যায় সাকুরায় গিয়ে দেখলাম মদের নেশায় চুর হয়ে আছে রাইসুল। আমাকে চিনতে পারলো না ও। সিদ্দিককে জিজ্ঞেস করলাম-ব্যাপার কি?

–কি জানি? বোধ হয় ওস্তাদের মন ভালো নেই। খুব টানছে।

–আমি একটা কাজের কথা বলেছিলাম, সেটার কত দূর কি হলো .....

–চিন্তার কিছু নেই। কাজ হয়ে যাবে।

–রাইসুলকে একটু মনে করিয়ে দিও।

–দরকার নেই, ওস্তাদ কিছু ভোলে না।

আমি দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে আরও দু-এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকলাম।

–ঠিক আছে সিদ্দিক, আমি তাহলে যাই।

–যাবেন কেন? আসুন। মাল টানুন।

–না এখন না। আমার কাজ আছে।

সিদ্দিক কিছু বললো না। গ্লাশে মুখ রাখলো। আমি বার থেকে বেরিয়ে কুৎসিত একটা গালি দিলাম। ইয়ের ইয়ে সাজ্জাদ, তোর ঘুঘুগিরি আমি ছোটাচ্ছি। তুমি শালা সৈকতকে চেনো না, ইত্যাদি ইত্যাদি.....

আজাদের অফিসের দারোয়ান লোকটা তাগড়া জোয়ান, দিব্যি কুস্তিগীরের মতো পুরুষ্ঠু শরীর, মাথা ভর্তি ঝাকড়া চুল, সব মিলিয়ে একটা ডাকু ডাকু ভাব। আমাকে দেখেই গুরুগম্ভীর গলায় বললো--- স্যার, এখন কারো সাথে দেখা করবেন না।

–আমার সাথে করবেন।

লতিফ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো। ---ঠিক আছে যান। স্যার তার রুমে আছেন।

তরতরিয়ে সিঁড়ি ডিঙিয়ে উপরে উঠে এলাম। আজাদ আমাকে দেখে বেশ অবাক হলো! –কি ব্যাপার সৈকত, তোমার তো এখন আসার কথা ছিলো না।

–না এসে থাকতে পারলাম না। সাজ্জাদ ফোন করেছে?

–করেনি এখনও। ভালই হলো তুমি এসেছো। একাকী খুব অস্বঃস্তি বোধ করছিলাম।

–কি ঠিক করলেন?

–তোমার বুদ্ধিই ভালো। ব্যাটাদেরকে আপাতত ঠা-া করে রাখি। রাইসুল কি বলে?

–মদে ডুবে আছে। ওতো আবার টাকা হাতে না পেলে এক পাও নড়ে না।

–কালই ওর টাকাটা পৌঁছে দাও। ওকে বলবে এক সপ্তাহের মধ্যে সাজ্জাদ এবং দেলোয়ারের লাশ দেখতে চাই।

–টাকা পেলে ও তিন দিনেই দেখিয়ে দেবে। বড় কঠিন চিজ।

সশব্দে হুঙ্কার ছাড়লো টেলিফোন। ঝট করে রিসিভার তুললো আজাদ। ---হ্যালো ? কে সাজ্জাদ? --- দশ লাখই পাবে। পরশু রাতে। আচ্ছা।

–কি বললো সাজ্জাদ?

–টাকা পেলে তথ্য প্রমাণগুলো দিয়ে দেবে। চেঞ্জটা পরশু রাতে হবে।

–পরশু! ব্যাটা অনেক সময় নিচ্ছে। সম্ভবত পালানোর

পথটাও পরিষ্কার রাখতে চায়।

–রাইসুলকে তৈরী থাকতে বলো। ওকে পালাতে দেয়া চলবে না। অনেক টাকার মামলা।

—কোন চিন্তা করবেন না। ধরে নিন, ওরা আর বেঁচে নেই। চলুন স্যার, বের হওয়া যাক। অফিসে তো আর কোন কাজ নেই।

—চলো। আমি একটু ক্লাবে যাবো, তুমি আসবে?

—যাই চলেন। অনেকদিন পেটে ভালো কিছু পড়ে নি।

○ ○ ○ ○ ○

সিরাজ সাহেবের বাসাটা খুঁজে পেতে বেশ সময় লাগলো, টানাটা একটু বেশীই হয়ে গেছে। সব কিছুই কেমন অচেনা অজানা ঠেকছে। গেটের সামনে দাড়িয়ে থাকা মেয়েটিকেও চিনতে পারলাম না, বড় সুন্দর মুখখানা।

—এই সৈকত ভাই, আপনি আবার মদ খেয়েছেন?

—হ, কে?

—মদ খেয়েছেন কেন?

—ও, চম্পা, বেশী খাইনি, মাত্র এইটুকুন। তুমি কখন ফিরেছো?

—ওমা, চেঁচাচ্ছেন কেন? আস্তে বলুন, সবাই শুনে ফেলবে তো।

—চেঁচাচ্ছি নাকি?

—আরও আস্তে। সন্ধ্যায় ফিরেছি। আপনি আমাকে আনতে গেলেন না কেন?

—অনেক কাজ ছিলো।

—আমরা আপনার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি। শেষে মাধুরী আপা নিজেই পৌঁছে দিয়ে গেলেন। সৈকত ভাই, ডাক্তার সাহেব বলেছেন কোন অসুবিধা হবে না। এখনও প্রাইমারী স্টেজে। কাল আবার যেতে হবে।

—কখন?

—সকাল ন'টা---দশটার দিকে।

—কাল আমার কাজ আছে। তুমি নিজেই মাধুরীর ওখানে চলে যেতে পারবে না?

—কেন পারবো না। কিন্তু সৈকত ভাই, আপনি থাকলে আমি খুব সাহস পেতাম।

–কিন্তু আমার যে অনেক কাজ.....

–প্লিজ, সৈকত ভাই---

–ঠিক আছে, থাকবো । তুমি ভয় পাচ্ছো নাতো?

–সত্যি কথা বলবো? একটু একটু পাচ্ছি । এবরশনের সময় বেশী রক্তপাত হয়ে অনেকে মারা যায় শুনেছি । সৈকত ভাই, আমিও যদি মরে যাই?

–তাহলে তো বেঁচেই গেলে, জীবন যন্ত্রণা লাঘব হলো ।

চম্পা ফিক করে হেসে ফেললো ।---আপনার নেশা এখনও কাটেনি । যান, বাসায় গিয়ে ঘুম দিন । আমি সকালে এসে আপনাকে ডেকে তুলবো ।

আমি ওকে পাশ কাটিয়ে গিয়েও আবার ফিরে এলাম ।

–আচ্ছা চম্পা, তুমি সুন্দর না মাধুরী সুন্দর?

চম্পা অবাক হয়ে বললো –কেন, মাধুরী আপা ।

–তুমি ভালো না মাধুরী ভালো?

–মাধুরী আপা ভালো ।

–তুমি তাহলে কি?

চম্পা চাঁপা স্বরে হাসতে হাসতে বললো – আমি আপনার মতো হাবা গঙ্গারাম । যান, ঘরে যান । মাতাল কোথাকার!

আমি ফিরতি পথ ধরলাম । এক্টো রে বইন, এক্টো! আমাকে মাতাল বললি, হাবা গঙ্গারাম বললি, চাঁপা স্বরে হাসলি, তোর মনটা ভালো হলো, হলো না? বেঁচে থাকতে গেলে অনেক রঙ্গই করতে হয় রে বইন, ভালোর জন্যেও করতে হয়, খারাপের জন্যেও করতে হয়..... সাজ্জাদের বাচ্চাটা আমার সাথে কেমন রঙ্গটাই না করলো একবার ভেবে দ্যাখ দিকিনি-কি নোংরা! কি নোংরা । সৈকত, অ সৈকত---ডাকাডাকি করিস নাতো, মা । ঘুম, বড় ঘুম--

মাঝ রাতে ঘুম ভাঙলো এক দামাল কিশোরের উদ্দাম গতিকে অনুসরণ করে, যুদ্ধের দামামা তার রক্তে জোয়ার আনে, তার যুদ্ধংদেহী ঘুমন্ত পিতৃ পুরুষেরা সহস্র হুঙ্কারে গর্জে ওঠে---মাগো, যুদ্ধে যাবো । স্বামীহারা নিঃসঙ্গ এক গ্রাম্য নারী, যে দেশ বোঝে না, যে যুক্তি বোঝে না, যে শুধু তার সন্তানের মুখে

জীবনের ছবি দেখে, সে তার কিশোর ছেলেকে পরম আর্তিতে বুকে চেপে ধরে--- নারে বাপ, তুই ক্যান যুদ্ধে যাবি? এতটুকু পোলা তুই; কিন্তু সেই কিশোর শোনেনি ।

নিঝুম কোন রাতে ঝিঁ ঝিঁ ডাক বাঁশঝাড় পেরিয়ে সে নিঃশব্দে পলাতক হতে চায় । মায়ের চেতনা যেন ঈশ্বর! অন্ধকার চিরে চিরে, বাঁশ ঝাড় ফুঁড়ে ফুঁড়ে, ছুটে আসে সেই অতীত, আজ কতদিনের, কিশোর? হাঃ হাঃ আর সৈকত । মা তোর সৈকত নাইরে, যন্ত্রণার পোকারা তাকে কুরে কুরে খেয়েছে, তার হৃদয় এখন পরিত্যাক্ত মৌচাক---হড় হড় করে বমি করে ফেল্লাম । বিছানা বালিশ মেঝেতে চটচটে তরল পদার্থ, বাতাসে বিশ্রী দুর্গন্ধ, অথচ তার মধ্যেই দিব্যি ঘুমিয়ে পড়লাম ।

পরদিন সকালে চম্পাকে ক্লিনিকে পৌঁছে দিয়ে আমি বাসাবোতে গেলাম । বিথী আমাকে দেখেই কপালে তিনখানা ভাঁজ ফুটিয়ে ফেল্লো ।

–কি ব্যাপার, মালপত্র গুছিয়ে চলে এলেন নাকি?

–হ্যাঁ, চলেই এলাম ।

–আপনার জিনিসপত্র কোথায়?

–জিনিসপত্র বলতে যা ছিলো সব এই ব্যাগের মধ্যেই ধরে গেছে । এছাড়া আর কিছু নেই ।

–বলেন কি? আপনার বিছানা, বালিশ এসব?

–সে সবতো বেচে দিলাম । তোমাদের এখানে যখন আছেই---

–বা-বাহ, আপনি তো চমৎকার মানুষ দেখছি । আসুন ভেতরে আসুন । আপনার বিছানা এটা । ওটাতে শফিক শোয়, অবশ্য ও প্রায় রাতেই বাসায় ফেরে না ।

–কি করে শফিক? পড়ে টড়ে বুঝি .....

–ও পড়াশুনা করবে? তাহলেই হয়েছিলো । বখাটেদের সর্দার । পার্টি-ফার্টি করে, দোকানে দোকানে চাঁদা তুলে বেড়ায়, মাঝে মাঝে মারপিট করে । হাতে পায়ে ইয়া মোটা মোটা ব্যা-জ নিয়ে বাসায় ফিরবে । সারারাত আমাকে জ্বালাবে, আপা চা খাওয়া, আপা গ্লুকোজ খাওয়া, আপা একটা গান গা--- যন্ত্রণার এক শেষ । বোকার মাতো দাঁড়িয়ে আছেন কেন, জামাকাপড় ছাড়ুন ।

–নাহ, আমি একটু বাইরে যাবো । ব্যাগটা রাখতে এলাম ।

–বেশ করেছেন । বসুন । মাকে ডেকে দিচ্ছি ।

বসতে বসতে বললাম---একটা আর্জি ছিলো ।

—পেশ করুন ।

—এক কাপ চা ।

—মঞ্জুর ।

আমি হেসে উঠলাম । বিথীও হাসলো । ---আপনাকে দেখে যতোটা কাঠখোট্টা মনে হয় আপনি ততোটা নন ।

—তোমাকে দেখে আমার চেয়েও কাঠখোট্টা মনে হয় ।

—একদম ফালতু কথা বলবেন না । চুপচাপ বসে থাকুন । চা আসছে ।

দু'মিনিটের মাথায় চা নিয়ে হাজির হলো বিথী ।

—ঘরে বিস্কুট-টিসকুট .....

—জানি ।

চায়ের কাপটা আমার হাতে চালান করলো ।

—রাগ করলেন নাকি?

—আমার রাগ-টাগ নেই, অনেকটা ভাড়াটেই বলা চলে । আমার জন্য চায়ের সঙ্গে কিছু-মিছু থাকাটা জরুরী নয় ।

—দেখুন অতো সেনসিটিভ কথাবার্তা আমার ভালো লাগে না ।

চা টা কেমন হয়েছে তাই বলুন ।

চুমুক না দিয়েই বললাম---চমৎকার ।

বিথী চোখ গরম করে তাকালো । ---সৈকত ভাই, আমার সাথে বেশী ঠাট্টা তামাশা করবেন না, আমি ওসব একদম পছন্দ করি না ।

—ঠিক আছে, আর কক্ষনো করবো না ।

—আর হ্যাঁ, ইতি বোধ হয় আপনার সাথে আলাপ করতে চায় ।

—তাতে লজ্জার কি আছে? ডাকো না ওকে ।

—ভেতরে আয়, ইতি। পর্দা ধরে হাবলার মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

—দেখ, বিথী আপা, বেশী বাজে কথা বলবি না। আমি মোটেই হাবলার মতো দাঁড়িয়ে নেই।

—যাক, আর ঝগড়া করতে হবে না। লাজুক লতা। ভেতরে আয়।

ইতি এলো না। বিথী মুখ বাঁকালো। ---ঢং!

আমি চায়ের কাপ খালি করে উঠলাম। ---খালাম্মাকে ডাকলে না?

—মা গোছল করছে। আসতে পারবে না।

—ও। তাহলে আমি যাই ফিরতে একটু রাত হবে। বারোটার মতো।

—আপনার যখন খুশী ফিরবেন। আমি অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকি। ডাকলেই দরজা খুলে দেবো।

—তাহলে তো ভালই হলো।

—অতো বক্ বক্ করছেন কেন? যান, কাটুন।

○ ○ ○ ○ ○

রাইসুলকে পেলাম হাতিরপুলে ওর ভাইয়ের বাসায়। আমাকে দেখে চোখ পিট পিট করলো।

—আপনি নাকি গতরাতে সাকুরায় গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ, তুমি চিনতে পারোনি।

—পারার কথা না। ঝেড়ে টেনেছিলাম। তা, কি ব্যাপার? হাতে ব্রিফকেস দেখলাম।

—টাকা এনেছি।

—কতো?

—পঞ্চাশ।

—গুড। সাজ্জাদদের তাহলে একটা হিল্লে হয়ে যাচ্ছে এবার।

—খুব তাড়াহুড়া করার কিছু নেই। কিন্তু শিকার ফস্কালে চলবে না।

—রাইসুল যে শিকারের নাগাল পায় সে শিকার কখনো ফস্কায় না। যাই হোক, আমার সাথে আর যোগাযোগ করার দরকার নেই আপনার। কাজ হলে আমিই খবর পাঠাবো।

–ঠিক আছে, তাই হবে। আমি যাই তাহলে।

–যান। চিন্তার কিছু নেই।

○ ○ ○ ○ ○

নাজমুল এবং আমার মধ্যে বেশ কিছু মিল আছে। প্রথমতঃ আমরা দুজনই ধড়িবাজ শ্রেণীর। দ্বিতীয়তঃ দু'জনারই নাক ভাঙা। তৃতীয়তঃ যুদ্ধ, যুদ্ধ করলেও গত এক যুগেরও বেশী সময়ে আমরা কেউই কোন রকম অস্ত্রটস্ত্র হাতে নেইনি। অবশ্য এতো সামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও আমরা পরস্পরকে আদৌ পছন্দ করি না।

কমলাপুরের এক তেতালা বাড়ীর চিলেকোঠায় ব্যাটাছেলের বসবাস। দোরগোড়ায় বসে শেভ করছিলো ও, আমাকে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতে দেখেই অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে পড়লো!

–এই উল্লুক, তুই আবার কি চাস?

–বিয়ে-টিয়ে করেছিস কিনা, দেখতে এলাম।

–পাগল শালা! বিয়ে করলে আমি তোকে বউ দেখাবো? ব্যাটা ধান্ধাবাজ।

–আচ্ছা, আমি ধান্ধাবাজ আর তুই সাধু মহারাজ।

–আমি তোর মতো ইতর না।

–আমিও তোর মতো ইল্লত না।

নাজমুলের শেভ হয়ে গেছে! ও গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললো---কি জন্যে এসেছিস।

–দুই ইয়ের বাচ্চার খোঁজ করছি। তুই কোন খোঁজ টোজ রাখিস কিনা জানতে এলাম।

–ইয়ে দুটোর নাম কি?

–সাজ্জাদ আর দেলোয়ার।

নাজমুল চোখ ছোট ছোট করে ফেললো।---বলিস কি? ওরা তো শুনলাম আজাদকে ব্লাকমেইলিং করছে। তুই আবার ওদের সাথে জড়িয়েছিস নাকি?

–আরে বাপ, বুদ্ধিটাতো আমারই ছিলো। কিন্তু এখন ঐ হারামী দুটো আমাকেই ফাঁকি দেবার তাল করছে।

—বুদ্ধিটা ভালই ছিলো । স্টোভে কেটলি বসালো নাজমুল ।---চা খাবি তো?

—দে । তোর হাতের চায়ের সোয়াদই আলাদা ।

—তোর মাথা ।

—আজকাল কাজকর্ম একদম ছেড়ে দিয়েছিস নাকি? ওর বিছানায় গ্যাট হয়ে বসতে বসতে বললাম — এই ভর দুপুরে ঘরে বসে আছিস ক্যান?

—আরে দূর, ঠা ঠা করে চক্কর মেরে বেড়াতে আর ভাল্লাগে না । ভাবছি এবার অন্য কিছু করবো ।

—কি করবি?

—এখনও কিছু ঠিক করিনি । দুটো কাপে চা ঢেলে আমার দিকে একটা এগিয়ে দিলো ।---কৌটায় চিনি আছে, নিয়ে নে ।

—তুই নিবি না ?

—চিনি-টিনি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি । ডায়াবেটিসের লক্ষণ দেখা দিয়েছে ।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়লাম ---আমাদের অনেক বয়েস হলোরে নাজমুল । কেমন করে যে এতোগুলো বছর কেটে গেলো টেরই পেলাম না ।

—পাবো কি করে? আগেও যেমন ফকির ছিলাম, এখনও তেমনি ফকির আছি । ফকিরদের আবার দিনরাত কি?

—ফকিরগিরি ঘোচানোর জন্যেইতো এই ঝুঁকিটা নিয়েছিলাম ; কিন্তু সব বোধ হয় ফসকে গেলো ।

নাজমুল ট্রাউজার পরে গায়ে শার্ট চড়ালো । ---ভাবিস না । ব্যাটাদের খোঁজ ঠিকই পাওয়া যাবে । কতো টাকা হেঁকেছিস?

—দশ লাখ ।

—দশ লাখ!

—হাঁ ।

—তাহলেতো খোঁজ করতেই হয় । ফিফটি ফিফটি, ঠিক আছে?

—এখনই মোচে তা দিসনে বাপ । ওদিকে আবার রাইসুলটাকে ফিট্ করতে হয়েছে---

–কেনরে? ঐ শালাকে আবার জুটিয়েছিস কেন?

–উপায় ছিলো না। আজাদকে বুঝ্ দিতে হবে তো। তাছাড়া সাজ্জাদদেরকে হাতে রাখার জন্যে ওর দরকার ছিলো। কিন্তু ব্যাটাদের পাখা গজিয়েছে। কাউকেই কেয়ার করছে না।

নাজমুল জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে বললো -তুই এতো কিছু করলি, আমাকে একটা খবর দিলিনা কেন?

–ভেবেছিলাম এই দাওটা মেরেই সটকে পড়বো। সেজন্যেই কোন চান্স্ নেইনি।

–তুই শালা খুব স্বার্থপর। নে চল। এই সুযোগটা ছাড়লে চলবে না। দশ লাখ টাকা! প্রত্যেকের ভাগে পাঁচ লাখ করে। দিব্যি ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করা যাবে। কি বলিস?

–তোর মোচে তা দেবার অভ্যেসটা গেলো না।

–যাবে কি রে, অভ্যেস বলতে তো ঐ একটাই আছে। দরজায় তালা লাগালো। –তুই যাবি আমার সাথে?

–কোথায়?

–বেশ জানা শোনা কয়েকজন ইনফর্মার আছে। দেখি ওরা কিছু বলতে পারে কিনা। যাবি?

–উহু। আমাকে একটু অন্য জায়গায় যেতে হবে।

–মাধুরী?

–নাহ। অন্য কাজ।

সিঁড়ি টপকে রাস্তায় নেমে এলাম আমরা। নাজমুল বিরক্ত মুখে বললো-কোন জাহান্নামে যাবি যা। কিন্তু আমাকে বিশ টাকা দিয়ে যা, পকেট একেবারে ঠন্ ঠন।

টাকাটা দিলাম। –তুই শালা খুব বদলে যাচ্ছিস। কি হয়েছে তোর?

–কি হবে আবার? বোধহয় ক্ষয় পোকায় ধরেছে। আঠারো বছর ধরে লড়াই করছি, আর কতো? এবার শালা মরিয়া হয়ে কিছু একটা করা দরকার---বিড় বিড় করতে করতে এগিয়ে গেলো নাজমুল।

আমাকে হঠাৎ ভাবালুতায় পেয়ে বসলো। আঠারো বছর ধরে লড়াই করলাম তবুও এতো নিঃস্ব থেকে গেলাম কেন? ভুলটা কোথায় করলাম? পাপের সমুদ্রে সাঁতার কেটে কেটে কতো মানুষ তীরে উঠে

গেলো, আমরা পারলাম না কেন? নাকি আমাদের মতো কিছু মানুষের সৃষ্টিই হয়েছে এমনিভাবে বেঁচে থাকার জন্য!

ক্লিনিকের বারান্দায় একাকী হাঁটছিলো মাধুরী। প্রথম বিকালের সোনালী এক টুকরো রোদ কি প্রগাঢ় দীপ্তিতে ওকে ঘিরে আছে! আমি মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকলাম। এই মেয়েটা আমার কতো কাছের মানুষ, অথচ একে আমি কতটুকু চিনি? চেনার চেষ্টা করেছি কখনো? মনে পড়ে না। খুব আপন মানুষদেরকে আমরা কখনো চিনতে চাই না। আমরা সবসময় রহস্য খুঁজে ফিরি।

মাধুরী আমাকে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো।

—এতক্ষণে এলে?

—চম্পার খবর কি?

—তেমন কোন অসুবিধা হয় নি। তবে খুব দর্বল হয়ে পড়েছে।

—দেখা করা যাবে না?

—উহু, ঘুমিয়ে আছে। ডাক্তার বলেছেন, বিরক্ত না করতে।

—খুব ভয় পেয়েছিলো?

—হ্যাঁ, আমাকে জড়িয়ে ধরে খুব কান্নাকাটি করছিলো।

—ডাক্তারের চার্জটা?

—সে সব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি ঐ বেঞ্চিটাতে চুপচাপ বসে থাকো।

—তুমিও এসো না।

—না, আমি একটু হাঁটবো।

আমি বেঞ্চিতে বসলাম না। সিগারেট ধরিয়ে ওর সাথে পায়চারি করতে লাগলাম। মাধুরী একটু বিরক্ত হলো।

—তোমাকে না বসতে বললাম।

—বসতে ইচ্ছে করছে না।

—আমার আঁচল ধরে হাঁটতে ইচ্ছে করছে।

—তা করছে।

মাধুরী হেসে ফেললো। —শয়তান কোথাকার।

চম্পার ঘুম ভাঙলো রাত এগারোটায়। আমার দু'হাত জড়িয়ে ধরে হু-হু করে কাঁদলো কিছুক্ষণ। আমি ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিলাম।---এই বোকা মেয়ে, কাঁদছো কেন? আর তো ভয়ের কিছু নেই। সব সমস্যা মিটে গেছে।

—সৈকত ভাই আমার না খুব খারাপ লাগছে।

—কেন?

—মেয়েরা যে মায়ের জাত। খারাপ লাগবে না?

আমি হেসে ফেললাম।---আরে ধ্যাৎ এখনও তোমার মা হবার বয়েস হয়েছে নাকি? চলো, তোমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসি। তোমার বাবা-মা এতক্ষণে দুঃশ্চিন্তা করতে শুরু করেছেন বোধহয়।

চম্পা বললো--- কাউকে যেতে হবে না। আমি একাই যেতে পারবো।

—এই অবস্থায়? তোমার মাথা খারাপ হয়েছে? মাধুরী, ওকে নিয়ে গেটের সামনে এসো। আমি স্কুটার ডেকে আনছি।

—সৈকত ভাই, এই অবস্থায় আমার সাথে যাওয়াটা আপনার উচিৎ হবে না। বাবা মা দেখে ফেললে অন্য রকম ভাবতে পারেন।

মাধুরী বললো---তুমি বরং একটা স্কুটার ডেকে দাও। আমিই ওকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

—জো হুকুম।

—ঢং করোনা তো। যলদি যাও। অনেক রাত হয়েছে।

বিদায়ের আগে আমাকে জড়িয়ে ধরে আবার কেঁদে উঠলো চম্পা।---আপনি আমার অনেক উপকার করলেন সৈকত ভাই, মায়ের পেটের ভাইও এতোটা করে না। আপনার কথা কক্ষনো ভুলবো না।

আমি হাসতে হাসতে বললাম---আমার কথা ভুলে গেলেও অসুবিধা নেই, কিন্তু এই ধরণের বোকামি আর করো না। মনে থাকবে তো?

—থাকবে।

—আমি ঐ বাসায় চলে গেছি। মাঝে মাঝে এসো, কেমন?

—ও বাসায় তো আমি যাই না।

—কেন?

—ওরা আমাদের দেখতে পারে না। খুব খারাপ ব্যবহার করে।

—এখন থেকে আর করবে না। তুমি আসবে।

—দেখি।

স্কুটার ছেড়ে দিলো, মাধুরী হাত নাড়লো।---এই হতভাগীনির কথা ভুলে যেও না।

আমি হেসে কিল দেখালাম। ভেঙচি এলো। হাঃ হাঃ। আমার বয়েসী মানুষরাও মাঝে মাঝে কেমন শিশুদের মতো আচরণ করে।

○ ○ ○ ○ ○

একবার ডাকতেই দরজা খুলে দিলো বিথী।---খেয়ে দেয়ে তো এসেছেন?

—না তো!

—কি ঝামেলা! এতো রাতে আপনাকে কে খাওয়াবে?

—অসুবিধা থাকলে বাদ দাও। কাল সকালে জমিয়ে নাস্তা করা যাবে।

—থাক , অতো দয়া দেখাতে হবে না। যান, হাত মুখ ধুয়ে আসুন। আমি ভাত নিয়ে আসছি।

—আমি একটু গোছল করবো।

—করলে করে ফেলুন। বেশী পানি খরচ করবেন না যেন।

—সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে?

—তবে কি আপনার জন্য জেগে বসে আছে?

—তোমার সাথে কথা বলাই দায়। ওকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই বাথরুমে ঢুকলাম। মিনিট পাঁচেক লাগলো গোছল সারতে। বিথী টেবিলে ভাত-তরকারী রেখে গেছে। ঠা-া। আর গরম-ঠা-া, দিয়ে যে গেছে তাই-ই কপাল। চোখ বুজে গপাগপ, সাবাড় করলাম। গ্লাসে পানি নিয়ে এলো বিথী।

—আপনাকে একটা কথা বলবো। কিছু মনে করবেন না।

—কে কি মনে করলো তা নিয়ে তোমার কোন দুশ্চিন্তা আছে বলে তো মনে হয় না।

—অন্যের মনে করাকরি নিয়ে বসে থাকলে দুনিয়া চলে না। যা বলি মন দিয়ে শুনুন। দু'একদিনের মধ্যে মায়ের হাতে হাজার খানেক টাকা দেবেন। আমাদের এখন খুব টাকা-পয়সার টানাটানি যাচ্ছে। আপনাকে বসে বসে খাওয়ানো যাবে না।

—বসে বসে খাওয়ার ইচ্ছেও আমার নেই। টাকাটা কালই দিয়ে দেবো।

—দেবেন, খুব বাধিত হবো। থালা-বাটি নিয়ে চলে গেলো ও। পাশের বিছানাটা ফাঁকা। অর্থাৎ ছেলেটা আজ আর ফিরছে না। কোথাও নেশা-টেশা করে পড়ে আছে হয়তো। এই সব ছেলেদের দায়িত্ববোধ থাকে না। লাইট নিভিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম, ভেতরে ঢুকলো কেউ।

—ঘুমিয়ে পড়েছেন নাকি?

—না। কি ব্যাপার বিথী? লাইট জ্বালবো?

—দরকার নেই। একটা কথা বলতে এলাম। আপনি আমাদের বাসায় থাকলে পাড়ার মানুষেরা অনেকে অনেক কথা বলতে পারে। আপনাকে যদি কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে, বলবেন আপনি আমাদের চাচাতো ভাই, গ্রাম থেকে এসেছেন।

—বলবো।

—মিথ্যে বলতে খারাপ লাগবে নাতো?

—নাহ। আমি দিনে রাতে একশ গন্ডা মিথ্যে কথা বলি।

—সেটা আপনাকে দেখেই বোঝা যায়। বিথী চলে গেলো।

আমি আপন মনে হাসলাম। এই মেয়েটা ইচ্ছে করে মানুষকে ক্ষেপায়।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলো সাথীর ডাকে। চোখ খুলেই ছেলেমানুষিতে ভরা মুখখানা দেখে মনটা তৃপ্তিতে ভরে উঠলো।

—এই সৈকত ভাই, এতো বেলা পর্যন্ত ঘুমুচ্ছেন কেন? ওঠেন না!

—উঠছি উঠছি। তুমি স্কুলে যাচ্ছো?

—হ্যাঁ! আপনি আমার স্কুলে যাবেন?

—উহু। স্কুল-টিস্কুল আমার একদম ভালো লাগে না।

বিথী তাড়া দিলো---এই, তোর না স্কুলের সময় হয়ে যাচ্ছে। তুই এখানে দাঁড়িয়ে বক্‌বক্‌ করছিস কেন? যা কাট্‌।

—যাচ্ছি ভাই যাচ্ছি। মুখফুলিয়ে বিশাল বইয়ের ব্যাগখানা কাঁধে ঝুলিয়ে চলে গেলো।

বিথী বললো---আপনিও উঠুন। মুখ ধুয়ে নাস্তা খেয়ে নিন। বড়'পা আপনার সাথে কথা বলবে।

—তুমি ভার্সিটিতে গেলে না?

—আমি কোথায় গেলাম না গেলাম তাতে আপনার কি? বিছানা ছাড়ুন। সবতো আমাকেই গোছাতে হবে।

আমি সুবোধ ছেলের মতো হাত মুখ ধুয়ে এলাম।---নাস্তা?

—বসুন। আনছি। বিছানার চাদরটাকে টেনে টুনে ঠিক করতে করতে বিথী বললো---বড়'পার সাথে একটু বুঝে শুনে কথা বলবেন। খুব রাশভারী মানুষ কিন্তু।

—বলো কি? আমার তো এখনই হার্টবিট বেড়ে গেলো।

—ইয়ার্কি মারবেন না।

নাস্তা নিয়ে এলো ও। প্রায় পিছু পিছু এলো গম্ভীর দর্শন মেয়েটি। ডিম্বাকৃতি মুখে ছোট লালচে ঠোঁট, টিকালো নাক, বড় বড় চোখ, সব মিলিয়ে তাকিয়ে দেখার মতো একখানা মুখ। আমি অস্বস্তি নিয়ে নড়েচড়ে বসলাম।

বিথী বললো---আমার বড়'পা। ওর কথা তো মা আপনাকে বলেছেন।

—হ্যাঁ, বলেছেন। আমি গতকাল সকালে এসেছি, আপনি তখন বাসায় ছিলেন না।

—আমি একটা কি-ার গার্টেনে পড়াই, সেখানে ছিলাম। আপনার নাম তো সৈকত, তাই না?

—জি, সৈকত আলী।

—কি করেন আপনি?

—আমার কোন ধরা বাঁধা কাজ নেই। ঢাকার কয়েকজন ব্যবসায়ীর সাথে আমার পরিচয় আছে। মাঝে মাঝে তাদের কিছু কাজ করে দেই।

—তাতেই চলে যায়?

—ভালই চলে ।

—ও । আমার নাম তিথি । ইচ্ছে হলে নাম ধরে ডাকতে পারেন । আচ্ছা, আপনি নাস্তা করুন । আমার স্কুলের সময় হয়ে যাচ্ছে ।

তিথি চলে যেতেই বিথী ফিসফিসিয়ে জানতে চাইলো কেমন লাগলো মাস্টারনীকে?

—ভালোই তো ।

—খুব সুন্দর দেখতে নাকি ফর্সা!

—হাঁ, খুব সুন্দর ।

—দেখবেন যেন প্রেমে-টেমে পড়ে যাবেন না । বড়'পাটা ছ্যাকা দিতে ওস্তাদ ।

হাসতে হাসতে বললাম---তুমি যাওতো এখান থেকে । একটু নিশ্চিন্তে খেতে দেবে না?

—খান বাবা খান, আমি যাচ্ছি । টাকাটার কথা মনে আছে তো?

—আছে । বেরুনোর আগে দিয়ে যাবো ।

গানের কলি ভাজতে ভাজতে ভেতরের ঘরে চলে গেলো বিথী । ইতির কোন সাড়া শব্দই নেই । এই মেয়ের ব্যাপারটা কি? আমাকে এতো লজ্জা পাওয়ার কি আছে?

○ ○ ○ ○ ○

লতিফ বেশ গুরু গম্ভীর গলায় বললো স্যার এখন আপনার সাথে দেখা করবেন না ।

—কেন । আমার তো আসার কথা ছিলো ।

—আমি অতো কিছু জানি না । স্যার আমাকে বিশেষ করে বলে গেছেন, আজ আপনার সাথে তিনি দেখা করবেন না । আপনি কাল আসতে পারেন ।

—আমার মনে হয় কিছু একটা গ-গোল হয়েছে । তুমি মি: আজাদকে গিয়ে আমার কথা বলো ।

লতিফ চোখ পাকালো---আপনি কি ভালোয় ভালোয় যাবেন?

শালা বেত্তমিজ, ভদ্দর লোকের সাথে ভদ্র ব্যবহার করতেও কেউ শেখায়নি তোকে? এক যুগ আগে এই রকম ব্যবহার করতিস তো জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলতাম তোর । লতিফকে একটা অগ্নিদৃষ্টি

হেনে পিছু হাঁটলাম। আজাদ মিয়ার প্ল্যানটা খুবই পরিষ্কার, আগে সাজ্জাদের কবল থেকে ছবিগুলো উদ্ধার করতে চায় সে, তারপর আমাকে আর রাইসুলকে লেলিয়ে দেবে। ভালো, আমিও সৈকত আলী। আমার টাকাও চাই, ছবিও চাই।

○ ○ ○ ○ ○

নাজমুল আমাকে দেখে কখনো খুশী হয় না। বাদরের মতো মুখ করে বললো– তুই আবার কেন এসেছিস?

–তোর পিি- চটকাতে। আজাদ শালা আমার সাথে দেখা করলো না আজকে।

–কেন? কিছু টের পেয়েছে নাকি?

–টের পাবে কি করে? তবে ছবিগুলো নিয়ে খুব দূর্ভাবনায় আছে মনে হয়। সামাদকেও বলেনি। সম্ভবত আদান-প্রদানের সময় আমি আশেপাশে থাকি সেটা চায় না।

–ছাগল ভাবে নাকি আমাদের? ওকে ফলো করেই তো জায়গা মতো চলে যাওয়া যায়।

–ওর মাথায় অতো বুদ্ধিশুদ্ধি থাকলে তো। সাজ্জাদদের কোন খবর পেলি?

–নাহ। গত এক সপ্তাহে কেউ ওদের দেখেনি।

–মিথ্যে বলছিস না তো?

–নারে বাবা, তোর কাছে মিথ্যে বলে কি লাভ?

–এখন কি করা যায় বলতো? প্ল্যান ট্যালান সব ভেস্তে গেলো দেখি।

–ঘাবড়াচ্ছিস কেন? আজাদের পিছু লেগে থাকছি আমি। টাকা দিতে ওকে তো কোথাও না কোথাও যেতেই হবে। সাজ্জাদরাও টাকা নিতে আসবে। ঐখানেই কিছু একটা এসপার-ওসপার করে ফেলতে হবে।

–রাইসুলকে দলে ভেড়ালে কেমন হয়? আমাদের কাছে তো মালপত্রর কিছুই নেই। সাজ্জাদ আবার রিভলভার নিয়ে ঘোরে। রাইসুলের মতো একজনের দরকার পড়বে।

–ওটাওতো শয়তানের চ্যালা। নিজেই সব গুবলেট করে দেয়।

–তা করবে না। ওর জবানের নড়চড় হয় না কখনো। নিজের ভাগটুকু পেলেই ঠা-া থাকবে।

–তাহলে আর এখানে ভ্যাদার মতো বসে আছিস কেন? যা, রাইসুলকে বাগা। আমিও বেরুচ্ছি। আজাদের অফিসের সামনে গ্যাট হয়ে বসে থাকবো।

–দেখিস নাক ডাকাতে শুরু করিস না।

–তুই গেলি? ওকে জুতো তুলতে দেখেই পালালাম।

–জায়গা মতো থাকিস। আমি ঘন্টা দু'তিনের মধ্যে আসছি।

রাইসুলকে ভয়ে ভয়ে পুরো ব্যাপারটা বয়ান করলাম। শালার মেজাজের কোন ঠিক ঠিকানা নেই। রেগে না গেলেই হয়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে ফালা ফালা করলো হারামীটা।

–এসব কথা প্রথমে বলেননি কেন?

–ইয়ে বোঝোইতো ভেবেছিলাম ঠিকঠাক মতই হয়ে যাবে। সাজ্জাদটা বিট্রে করলো বলেই না....।

–সৈকত ভাই, আপনি মাঝে মাঝে খুব গাধার মতো কাজ করেন। আমাকে আগে বললে লাভটা কি হতো জানেন, সাজ্জাদ আর দেলোয়ারকে ধোলাই খালে পাঠিয়ে দশ লাখের প্রত্যেকটা পয়সা আমরা দু'জনেই মেরে দিতে পারতাম। এখন ঐ শুয়োরের বাচ্চা দুটোকে খুঁজে বের করাওতো এক ঝামেলা।

–আজ রাতে আজাদের টাকা দেবার কথা। আমি আর নাজমুল ওর পিছু নেবো ভাবছি। তুমি আসবে আমাদের সাথে? টাকা যদি পাওয়া যায়, সমান ভাগ হবে।

সিদ্ধান্ত নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলো না রাইসুল। –আমি আপনাদের সাথে যাচ্ছি। আজাদের উপর চোখ রাখছে কে? নাজমুল ভাই?

–হ্যাঁ। আমাদেরও এবার যাওয়া দরকার।

–যাই চলেন। দ্রুত পোশাক পালটে নিলো ও।

কোমরে চকচকে একখানা রিভলভার গুজে শার্টটা প্যান্টের উপর ছড়িয়ে দিলো, বাইরে থেকে দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই। পকেটে কয়েক রাউ- বুলেট ঢোকালো।

–সৈকত ভাই, একটা কথা বলি আপনাকে?

–বলো।

–আপনি আমাকে ভয় পান। এটা ঠিক না। আপনাকে আমার খুবই ভালো লাগে। আমি কোনদিন জেনে শুনে আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবোনা। চলেন।

আমি নিঃশব্দে ওকে অনুসরণ করলাম। রাইসুলের মতো মানুষের কথা কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য জানি না; যাদের জীবনের মায়া নেই তারা খুব অদ্ভুৎ মানুষ হয়। রাইসুল একজন অদ্ভুৎ মানুষ।

○ ○ ○ ○ ○

আজাদ অফিস থেকে বেরুলো ঠিক সাড়ে দশটায়। হাতে ব্রিফকেস, ঘাম চিকচিকে মুখ। নার্ভাস ভঙ্গিতে চারদিকে চোখ বুলিয়ে গাড়ীতে উঠলো। স্টার্ট দিলো। মসৃণ বেগে পুরানো পল্টনের দিকে এগিয়ে গেলো।

রাইসুল ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাঁধে খোঁচা দিলো।---একশ গজের মতো পেছনে থাকবেন। হারালে চলবে না।

ড্রাইভার ছেলেটি বেশ সপ্রতিভ ধরনের। চটপট জবাব দিলো ---আমার চোখ ফাঁকি দিয়ে যাবে কোথায়? একদম নিশ্চিত থাকুন।

আজাদকে খুব একটা সতর্ক মনে হলো না। মাঝারী গতিতে শাহবাগের মোড় ঘুরে ফার্মগেট অভিমুখে গাড়ী ছোটালো সে, আমরা জোঁকের মতো পিছনে লেগে আছি, বাছাধন, আজ তোমার একদিন কি আমার একদিন। আর সাজ্জাদটাকে যদি নাগলের মধ্যে পাওয়া যায়-----। গতি বাড়িয়ে দিয়েছে আজাদ। আমাদের ট্যাকসি পাল্লা দিয়ে গতিবেগ বাড়ালো। সাৎ সাৎ করে কয়েকটা মিনি বাসকে কাটিয়ে গেলাম। ফার্মগেট পেরিয়ে ঈন্দিরা রোড হয়ে শেরে বাংলা রোডে, সেখান থেকে আসাদ গেট হয়ে মোহাম্মদপুরে, ডানে বাঁক নিয়ে যাওয়া হলো ট্যাকসিটাকে, তীক্ষ্ণ বাঁক গলির অরণ্যে আজাদকে হারিয়ে ফেলার বিন্দুমাত্র আগ্রহ আমাদের কারুরই নেই। নুরজাহান রোডের এক চিপা গলিতে গাড়ি থামালো আজাদ। ইতস্তত ভঙ্গিতে নীচে নামলো, চারদিকে সন্দেহের চোখে তাকালো, গাড়ীর ভেতর থেকে ব্রিফকেসটা বের করেই হনহন করে গলিপথে হারিয়ে গেলো। প্রায় পঁচিশ গজ পেছনে গাড়ী থামালো রাইসুল।

–সৈকত ভাই নামেন, মিঃ তৈয়ব, আপনি এখানে অপেক্ষা করুন।

–ওকে স্যার। নো প্রবলেম।

রাইসুল তার হাতে দুটো পঞ্চাশ টাকার নোট গুজে দিলো। প্রায় দৌড়ে গলি মুখে হাজির হলাম আমরা। বড়জোর বিশ গজ দীর্ঘ গলি। কয়েকটা বাসার জানালা গলে পালিয়ে আসা লালচে আলোয় আধিভৌতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। আজাদকে কোথাও দেখা গেলো না। আমি পরিপূর্ণ হতাশ হয়ে পড়লাম।

—যাহ। সব মাটি।

—চুপ! রাইসুল ধমকালো। সতর্ক পদক্ষেপে দ্রুত গলির প্রত্যেকটা বাসার উপর চোখ বুলাচ্ছে ও।

—যাবে কোথায়? এখানেই কোথাও ঢুকেছে। চোখ কান খোলা রাখুন।

পাশাপাশি দুটো চারতলা চিকন ধাচের বাড়ী। পরিপূর্ণ অন্ধকার। উপরে কোথাও কড়া নাড়ার শব্দ হলো। আমরা উৎকর্ণ হয়ে শব্দের অবস্থান বোঝার চেষ্টা করলাম। ঠিকমতো ঠাহর হলো না। রাইসুলের চোখ জ্বলজ্বল করে জ্বলতে শুরু করেছে। ---'আপনারা এটাতে ঢু মারুন, আমি পাশেরটা দেখছি।' গেট পেরিয়ে ত্বরিতে সিঁড়িঘরের অন্ধকারে হারিয়ে গেলো সে।

আমি এবং নাজমুল কয়েক মুহুর্ত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। নাজমুল ফিসফিসিয়ে বললো,

—খালি হাতে যাওয়াটা টিক হবে কি? গুলী টুলি করে দেয় যদি।

—দিলে দেবে। চল যাই। ঝুঁকি না নিলে কেষ্ট মিলবে না।

—চল তাহলে।

প্রায় নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে উঠছি দু'জন। ঘন অন্ধকারে নিজের পা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। ভেতরটা একদম প্রশান্ত। একতালা, দোতালা, তিনতালা, চারতালা্ উঠতেই ফিসফিসিয়ে শব্দ ভেসে এলো। আজাদের গলা।

আমরা দু'জন দরজায় কান পাতলাম। আজাদ কাঁপা গলায় শাসালো---তোমরা টাকা চেয়েছিলে, এনেছি পুরো দশ লাখ। নেগেঠিভগুলো দাও এবার। নইলে.....

সাজ্জাদ খ্যাক খ্যাক করে হাসলো---বেশী বক্ বক্ করিস না শালা। ভেবেছিস মাত্র দশ লাখেই তোকে ছেড়ে দেবো?

দেলোয়ার বললো---দিয়ে দাও ওস্তাদ।

—তুই চুপ থাক!

—সাজ্জাদ, আমি তোকে একটা পয়সাও দেবো না। ছবিগুলো নিয়ে তুই যা খুশী করগে....

—ঠকাস্ করে একটা শব্দ হলো। হড়মুড় করে মেঝেতে কিছু পড়লো। কি ঘটছে বুঝতে আমাদের দুজনার অসুবিধা হলো না। আজাদ সাহেবকে একটু ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হলো।

সাজ্জাদ কথা বললো---দেলোয়ার বাতিটা নিভিয়ে দে।

—আজাদের কি হবে?

—কি হবে আবার? ওভাবেই পড়ে থাক। মাঝরাতের দিকে জেগে যাবে।

আমরা দুজন সতর্ক হবার আগেই দরজা খুলে গেলো। ব্রিফকেস হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে সাজ্জাদ, আমরা দুজন ঠিক ওর মুখোমুখি, দেলোয়ার মোমবাতি নিভিয়ে দিলো, চারদিকে নিমেষে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সাজ্জাদ জঘন্য একটা গালি দিয়ে নড়ে উঠলো, সম্ভবত পিস্তলের দিকে হাত বাড়ালো। আমি চোখ বুজে ঘুষি চালালাম, কোথায় লাগলো আল্লাহ মালুম, ব্যথায় আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে এলো। নাজমুল অন্ধের মতো পা চালাচ্ছে, কোথাও লাগছে বলে মনে হলো না। আমি বাঁ হাটু চালালাম, ঘোৎ করে একটা শব্দ হলো, নির্ঘাৎ সাজ্জাদের পেটে লেগেছে, দ্বিগুণ উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিলাম, ব্রিফকেসের কঠিন শরীর চোয়ালে এসে আঘাত করলো, চোখে শর্ষে ফুল দেখতে লাগলাম। বড় জোর সেকে- পাঁচেক হবে। নাজমুলের গলা কানে এলো,

—এই সৈকত, বেঁচে আছিস তো দোস্ত?

—আছি রে গর্দভ। কিন্তু থোতনাটা বোধ হয় দু'ফালি হয়ে গেছে। শালা ইয়ের বাচ্চা গেলো কোনদিকে ওরা?

—উপরে। একটার ঠ্যাঙ চেপে ধরেছিলাম বুঝলি, কিন্তু সামলাতে পারলাম না।

—উপরে গেলো কেন? উপরেতো ছাদ।

—ওরা জানে আর ওদের আল্লা জানে। কিন্তু মরে গেলেও খালি হাতে ছাদে যাচ্ছি না আমি। অতো বীরগিরি ফলানোর কোন দরকার নেই।

গুলির শব্দে পুরো দালানটাই থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো যেন!

একবার, দুবার। নাজমুল ককিয়ে উঠলো ---নির্ঘাৎ রাইসুলের কাজ। শালা তো জেলের ঘানি টানবে দেখছি। সৈকত, চল সময় থাকতেই পালাই।

—আর কথা বলিস না, না, না।

সিঁড়ির শেষ ধাপগুলো টপকে নামার সৌভাগ্য হলো না, ধাক্কা-ধাক্কি করে গড়িয়ে গড়িয়ে থামলাম। নাজমুলের কি হলো বলতে পারবো না। তবে আমার বাঁ পায়ের গোড়ালিটা নতুন বৌয়ের মতো জড়সড় হয়ে পড়লো। খান চার পাঁচ গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় যখন নামলাম তখন দু'জনেরই মরণ দশা।

আমি বললাম---এই শালা যাবি কিসে? ট্যাক্সিতো ওদিকের রাস্তায় ।

—গুল্লি মার তোর ট্যাক্সির । এখন একটা স্কুটার-টিস্কুটার নিয়ে এই এলাকা ছাড়তে পারলে বাঁচি । নাকও গেলো নরুনও গেলো অবস্থা না হয় । চল চল ।

—রাইসুলের জন্য দাঁড়াবি না?

—ওরটা ও বুঝুক । বক্ বক্ না করে পা চালা । এই স্কুটার, এই.....

ফার্মগেটে আমাদের স্কুটার থামালো রাইসুল ।---ট্যাক্সিতে চলে আসুন সৈকত ভাই ।

আমি এবং নাজমুল থতমত খেয়ে গেলাম ।

—ইয়ে রাইসুল, পালানো ছাড়া কোন উপায় ছিলো না আমাদের ।

—কথাবার্তা পরে হবে । আগে উঠুন তো ।

যা আছে ভবিতব্যে । আমরা দু'জন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে শেষ পর্যন্ত ট্যাক্সিতেই সওয়ার হলাম । আমি ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞেস করলাম-গুলিটা কি তুমি ছুঁড়ে ছিলে?

—হ্যাঁ । অন্ধকারে ভালো মতন বুঝতে পারিনি । তবে সাজ্জাদের গায়ে যে আঁচড় কেটেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই । শালার কপালটাই খারাপ সৈকত ভাই, টাকাটা ফুড়ুৎ হয়ে গেলো । ও হারামিটা যে দুই ছাদে মই লাগিয়ে কেটে পড়ার প্ল্যান করবে সেটা ঘূর্ণাক্ষরেও যদি টের পেতাম....

নাজমুল ক্ষুব্ধস্বরে বললো - সাজ্জাদটা দুদিন আগেও তো বোকার হদ্দ ছিলো । হঠাৎ এমন বুদ্ধির রাজা হয়ে উঠলো কিভাবে?

—দুঃখ করবেন না, নাজমুল ভাই । ঐ টাকা আমি ঠিকই উদ্ধার করবো, শুধু দিনকতকের ব্যাপার মাত্র । একটু ধৈর্য ধরেন ।---রাইসুল হঠাৎ চুপ করে গেলো এবং আপন মনে আঙুল নেড়ে নেড়ে কোন গভীর পরিকল্পনা আঁটতে লাগলো । আমরা দুই বন্ধুতে পরম যত্নে শরীরের ক্ষতগুলোতে হাত বোলাতে লাগলাম । আর কিছু না হোক একটা আজব অভিজ্ঞতা তো হলো!

চার

বিথী দরজা খুলেই বললো---এতক্ষণে এলেন! শুধু মাত্র আপনার জন্যেই আমাকে বাসায় থাকতে হলো।

—কেন, কি হয়েছে?

—শফিকটা মার খেয়ে হাসপাতালে পড়ে আছে। সবাই সেখানেই গেছে।

—সিরিয়াস .....

—মনে হয়, ঘাড়ে, পিঠে রামদার কোপ লেগেছে। প্রচুর রক্ত পড়েছে নাকি। আমার যাওয়াটা খুব দরকার ছিলো, যেতে পারলাম না। আপনি আরেকটু তাড়াতাড়ি ফিরতে পারলেন না?

—এদিকে যে এই সব ঘটনা ঘটছে আমি কি করে জানবো? কিন্তু ওকে মারলো কারা?

—কারা মারলো কি করে বলবো? তবে ওর মতো ছেলেদের শত্রুর অভাব থাকে না। ছোটখাটো ঝগড়া-ঝাটি থেকে বড় বড় শত্রু তৈরি হয়ে যায়। আপনাকেও তো কাহিল দেখাচ্ছে, মারপিট করে এলেন নাকি?

—না না, ছোটখাটো একটা দূর্ঘটনা।

—আমার কাছে মিথ্যে বলার কোন দরকার নেই। ছেলেদের এই ধরনের ছেলেমানুষি আমার ভালই লাগে। যান, গোছল সেরে নিন, আমি আপনার ভাত-তরকারি নিয়ে আসছি।

তাজ্জব মেয়েরে বাবা! নিঃসন্দেহে বিরল প্রজাতির, তবে আমার অবাক হওয়ার অবস্থা নয়, বাম পায়ের যন্ত্রণাটা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

—ভাত-টাত লাগবে না। ব্যথার ঔষধ থাকলে খান কতক এনে দাও।

বিথী গোড়ালিটা লক্ষ্য করলো, ---বেশ ফুলেছে দেখছি। মলম আছে ডলবেন?

—মলম হোক আর শেকড়-বাকড় হোক কিছু একটা এনে দাও। ব্যথায় দাঁত কপাটি লেগে যাচ্ছে।

—অতো ছটফট করবেন না। চুপচাপ শুয়ে থাকেন। মলম আনছি।

সারাটা রাত রীতিমতো নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হলো, গোড়ালির ব্যথা কমলে থুতনিরটা নড়েচড়ে ওঠে, থুতনিরটা কমলে পায়েরটা--- সাজ্জাদের শ্রাদ্ধ করলাম। মারে, কি কষ্ট! কি কষ্ট! সৈকতরে এই বুড়ো বয়সেও তোর কা-জ্ঞান হলো না, অ সৈক---।

বিথী যখন আমার ঘুম ভাঙালো তখন সবে ভোর হচ্ছে,--- ওঠেন, জলদি ওঠেন। আমার সাথে একটু যেতে হবে।

–কোথায়?

–কোথায় মানে? কাল রাতে বললাম না শফিকটা হাসপাতালে আছে। তাড়াতাড়ি উঠুনতো ছাই।

উঠতেই হলো। হাজার হোক আমারটা সামান্য মচকা-মচকির ঝামেলা, শফিকেরটা খানদানি ব্যাপার স্যাপার। সদর দরজায় তালা মেরে আমরা যখন রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম তখন সবেমাত্র কাকদের ঘুম ভেঙেছে।

–একটা রিক্সা পান কিনা দেখুনতো সৈকত ভাই।

–রিক্সা? এতো ভোরে? রিক্সাওয়ালাদের তুমি ভাবোটা কি?

–অতো বকবকানিতে কাজ নেই। পারবেন না বললেই তো হয়, দরকারের সময় আপনাকে দিয়ে কোন কাজই হয় না। চলুন হাঁটি।

–বলো কি? হাসপাতালটা কাছাকাছি নাকি?

–কাছাকাছি হবে কেন? ঢাকা মেডিকেল কি কাছে? কিন্তু বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে হাঁটতে থাকাও তো ভালো। চলুন।

চলুন বললেই চলুন। আমার যে গোড়ালি ফুলে ফুটবল হয়ে গেছে, সে খেয়াল আছে? মাশ্‌শালা, মেয়েদের সাথে তর্ক করতে যাওয়াই বৃথা। হাঁটতে বলছে হাঁটতে থাকি, হঠাৎ চিৎ হয়ে শুয়ে পড়বোখন।

○ ○ ○ ○ ○

শফিকের খানদানি মারের অবস্থা দেখে আমার ছিঁচকে ব্যথা উড়াল দিলো। শরীরের অর্ধেকটাই ব্যা-জের নীচে ঢাকা পড়েছে। মুখে, মাথায় পর্যন্ত বেশ কয়েকটা ষ্টিচ। তবে ছেলেটার প্রাণশক্তি অফুরন্ত, তার মা বোনদের চেয়ে তাকেই বেশী সতেজ দেখাচ্ছে।

–এই বিথী আপা তুই এতো নিষ্ঠুর কেন বলতো। কাল আমি তোর কথা কতো বললাম, তুই এলি না কেন?

বিথী মুখ ঝামটা দিলো – আমি কি তোর চাকর যে ডাকলেই আসবো? বাসায় আমার কাজকর্ম থাকে না?

শফিক ফিক ফিক করে হাসতে লাগলো ।

—আমার উপর খুব রেগেছিস, ঠিক না ।

—আরে নাহ, তোর উপর রাগ করতে যাবো কোন দুঃখে? তুই একটা মানুষ নাকি ।

—আচ্ছা, আমি তাহলে মানুষই না । আমি মরে গেল তুই খুব খুশী হতিস, না ।

—হতাম, খুব খুশী হতাম । এবার চুপ থাক ।

শফিককে হাসপাতালের লম্বা করিডোরে ঢালাও ভাবে পাতা একটি বেডে জায়গা দেয়া হয়েছে, তার বেডটাকে ঘিরে আমরা ক'জন চুপচাপ দাঁড়িয়ে । আরো কয়েকটি বেডেও বেশী ভীড় দেখলাম । তিথি, ইতি, সাথী শফিকের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে, চোখ দেখলেই বোঝা যায় গতরাতে ওদের কারোরই এক ফোঁটা ঘুম হয়নি । ইতি আমাকে দেখে লজ্জা পেলো না, তার গালে শুকনো পানির দাগ, সম্ভবত কান্নাকাটি করেছে ।

বিথী নীচু গলায় বললো---শফিক আর ইতির মনে মনে দুজনের খুব টান; কিন্তু বাইরে রাতদিন ঝগড়া ঝাটি করে ।

আমি অবাক হয়ে বললাম---ওদের চেহারার তো তেমন একটা মিল নেই ।

—মিল থাকবে কি করে? একজন ছেলে আরেক জন মেয়ে না ।

—তা ঠিক ।

খালাম্মা শান্ত গলায় বললেন---তুমি এসেছো আমি খুব খুশী হয়েছি, বাবা, শফিকের সাথে তোমার পরিচয় হয়নি---- ।

শফিক রাগী চোখে তাকালো---হারামি বুড়ো এটাকেই পাঠিয়েছে নাকি?

—ছিঃ শফিক এভাবে কথা বলে না বাবা ।

শফিক মায়ের কথা কানেই নিলো না ।

—রেডি থাকবেন । আমি সেরে উঠেই আপনাকে খুন করবো ।

—আমাকে খুন করে কি লাভ? তোমার সাথে আমার কিসের শত্রুতা?

—তা ঠিক! আপনাকে না । আমি ঐ বুড়োটাকেই খুন করবো । অবশ্য বুড়োর আগে লাইনে আরো দু'জন আছে । আগে আসিলে আগে পাইবেন ভিত্তিতে ও দুটোর ব্যবস্থা আগেই করতে হবে ।

বিথী কড়া ধমক লাগালো---শফিক, আরেকটা বাজে কথা বলবি তো এবার রামদা এনে আমিই তোকে কোপাবো।

শফিক হাঃ হাঃ করে হাসতে লাগলো, ---আর কোথায় কোপাবি? জায়গা রাখলে তো!

তিথি শান্ত গলায় বললো---শফিক, অতো কথা বলো না। ডাক্তার সাহেব বারণ করেছেন।

শফিক মুখে কুলুপ এঁটে ফেললো। রীতিমত আশ্চর্য ব্যাপার। আর যাইহোক কাউকে মান্যগণ্য করে বলে কখনো শুনিনি।

দুপুরের দিকে কালোমতন একজন ভদ্রলোক ফর্সামতন একজন মহিলাকে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলেন। বিথী চোখমুখ কুঁচকে বললো –বড় ভাইয়া, জন্মের স্ত্রৈণ।

খালাম্মা মলিন স্বরে বললেন - গিয়াস, তুই আবার অফিস ফেলে এলি কেন?

–মা, কি উদ্ভট কথা বলছো তুমি! আমার ছোট ভাইয়া মর-মর হয়ে পড়ে আছে আর আমি নিশ্চিত মনে অফিস করবো? তোমরা আমাকে ভাবোটা কি বলতো? কি রে শফিক, কেমন লাগছে এখন? রাতদিন গোলমাল পাকিয়ে না বেড়ালে তো পেটের ভাত হজম হয় না, এবার বোঝ ঠ্যালা?

শফিক হাসতে হাসতে বললো---বড় ভাইয়া, তোমাকে একবার কারা মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলো মনে আছে? তুমি ভালো হয়ে দু'টোকে কুপিয়ে আমার মতো ফ্লাট করে ছিলে---

গিয়াস খুবই লজ্জা পেয়ে গেলো। ---তুই তো তখন খুবই ছোট। এসব জানলি কি করে?

–মা বলেছে। তোমার কথা উঠলেই আমরা এইসব গল্প করি।

–ধুৎ ধুৎ, এগুলো আবার বলার মতো কিছু নাকি? কিন্তু তোর এখানে কোন ডাক্তার-ফাক্তার নেই কেন? সব শালা লাট সাহেবের বাচ্চা, একটা দুধের বাচ্চা মরতে মরতে বেঁচে এসেছে অথচ সেদিকে কারো কোন খেয়ালই নেই। শফিক তুই চুপচাপ শুয়ে থাক, বেশী কথাবার্তা বলিস না, আমি এক্ষুণি একটাকে বগলদাবা করে নিয়ে আসছি।

তিথি শীতলগলায় বললো---তার দরকার নেই ভাইয়া, ওরা সকালে এসে একবার দেখে গেছেন। তুমি আমাদের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়াও।

–আরে না না তিথি, তুই জানিস না, এইসব জখম খুব সিরিয়াস। একটু গাফিলতি হলো তো, গ্যাংগ্রীন। আমি যাবো আর আসবো। রীতা, তুমি শফিকের পাশে একটু বসো।

গিয়াস অত্যন্ত বিচলিত ভঙ্গিতে, ত্রিশ-চল্লিশ গজ দুরে দাঁড়িয়ে থাকা একজন মহিলা ডাক্তারকে পাকড়াও করার জন্য ছুটলো। রীতার বয়েস বেশী নয়, সম্ভবত তিথির চেয়েও কিছু কম। সে সবার থেকে কিছুটা দূরত্বে দাঁড়িয়ে চোখ মুখ অন্ধকার করে পাশের বেডের রুগিনীর দিকে চেয়ে আছে। বুঝলাম এই পরিবারের সাথে মেয়েটার সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত। স্রেফ না এলেই নয় তাই আসতে হয়েছে। বিথী তার দিকে কঠাক্ষ হেনে বেশ জোরেই বললো---এহ ঢং। কে আসতে বলেছে ওকে।

খালাম্মা ধমক দিলেন---বিথী, তুই বডডো বকিস্।

—বকাবকির কি দেখলে তুমি! এই পটের বিবিটা এখানে ফাও ফাও এসে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

তিথি ডাকলো---রীতা, ওখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন? এখানে এসো। শফিকের সাথে কথা বলো।

রীতা অস্বস্তি নিয়ে শফিকের পাশে এসে দাঁড়ালো---কেমন আছো শফিক?

শফিক চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, ---আপনার নাম্বার চার।

—মানে?

সাথী গোবেচারা ভাবে বললো, ---ভাইয়া সেরে উঠে কাকে কাকে খুন করবে তার একটা লিষ্ট করছে। জানো, ভাবী তোমার আগে আরো তিনজন আছে। সৈকত ভাই তিন....

আমি হা-হা--করে উঠলাম—আরে না, আমি না, আমি না, সিরাজ সাহেব.....।

তিথি সাথীর গালে একটা চড় বসিয়ে দিলো।

রীতা কাঁদ কাঁদ গলায় বললো-এসব কি আম্মা? আমি কি এমন করেছি যে আমাকে শফিক এমন একটা কথা বলবে? আপনারা ওকে কিছু বলবেন না? আপনাদের ছেলে ঘরজামাই হয়েছে, সেটা কি আমার দোষ....

বিথী ফোঁড়ন কাটলো---ঢং দেখো মহারানীর। রীতা এবার সত্যি সত্যিই কেঁদে ফেললো। তিথি তাকে টেনে এক পাশে সরিয়ে নিয়ে গেলো, খালাম্মা আমার দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাশে ভাবে বললেন---মেয়েটার আসলে খুব একটা দোষ নেই, বাবা, সবই ভবিতব্য।

শফিক বললো---তুমি চিন্তা করো না মা। তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে ওটাকে আমি এক নম্বরে ট্রান্সফার করলাম।

—শফিক, তুই যদি আর কোন দিন এই ধরনের কথা বলিস তাহলে আমার মাথা খাস।

–আরে ধুর, মানুষের মাথা খাওয়া যায় নাকি?

বিথী বল্‌লো – দেখেছেন সৈকত ভাই, মেরে তক্তা বানিয়ে দিয়েছে তবুও ওর চাপার কি জোর ।

গিয়াস সত্যি সত্যিই সেই মহিলা ডাক্তারটিকে পাকড়াও করতে পেরেছে । মেয়েটি তিথিরই বয়সী, ইন্টার্ণি করছে । তার চোখে পুরুলেনসের চশমা, হাতে অলস ভঙ্গিতে চকচকে কালো রঙের একখানা স্টেথিস্কোপ ঝুলছে, মুখখানা হাসি হাসি, বুঝলাম, একে দিয়ে ডাক্তারী হবে না । ডাক্তারদের মুখ হতে হবে কোষ্টকাঠিন্যের রোগীর মতো খটমটে, দেখা মাত্রই রোগীর যাবতীয় অসুখ বাপ বাপ করে পালাবে ।

মেয়েটি শফিকের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে ফেললো ।---ওকে তো আমি একবার এসে দেখে গেছি । আর কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই, খুব শক্ত ছেলে ।

শফিক সঙ্গে সঙ্গে যোগ করলো---আপনিও খুব সুন্দর, আপা ।

–এক থাপ্পড় মারবো, পাজি ছেলে । এই নিয়ে তুমি আমাকে চারবার ঐ কথা বললে ।

শফিক দাঁত বের করে হাসতে লাগলো---কি করবো আপা খুব বলতে ইচ্ছে করে যে ।

–ইচ্ছে করলেও বলবে না । তুমি সেরে ওঠো, তোমাকে আমাদের বাসায় নিয়ে যাবো, আমার একটা ছোট বোন আছে, আমার চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর ।

একটা হাসির হল্লোড় উঠলো, গিয়াস সে হাসিতে যোগ দিলো না, সে চোখেমুখে ভাঁজ ফুটিয়ে বললো,

–না, না ম্যাডাম, আপনি ভালো করে আরেকবার দেখুন ওকে । আমার এ একটাই ভাই, ওর কিছু হয়ে গেলে---বুঝতেই তো পারছেন ।

–কিচ্ছু হবে না মি: গিয়াস, আপনি অযথা দুঃশ্চিন্তা করছেন । ওর এখন শুধু বিশ্রাম দরকার । আমার তো মনে হয় আপনারা ওকে কালই বাসায় নিয়ে যান । হাসপাতালের পরিবেশ তো দেখতেই পাচ্ছেন, এখানে থাকলে লোকসান ছাড়া লাভ নেই ।

–না, না, সে কি করে হয় । হাসপাতাল আর বাসা কি এক হলো?

–সেটা আপনাদের সিদ্ধান্ত, আমার কিছু বলার নেই । আমি এখন যাই । এই যে পাজি ছেলে, বেশী বক বক করো না, চুপচাপ শুয়ে থাকো ।

–মনে থাকে যেন, আপনার ছোট বোনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবেন বলেছেন ।

মেয়েটি হাসতে হাসতে মেঝেতে গড়াড়ড়ি খাওয়ার উপক্রম হলো- দেবো, দেবো, বডডো ফাজিল তুমি । যাই ।

রীতার কান্না থেমেছে । সে থমথমে মুখে তিথির পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো । এবার তীক্ষ্ণ গলায় বললো, --- গিয়াস, আমাকে বাসায় রেখে এসো । আমার এখানে ভালো লাগছে না ।

–কেন? শফিকের সাথে কথা বলেছো?

–তুমি আমাকে বাসায় পৌঁছে দেবে কিনা বলো?

–কি যন্ত্রণা! এই অবস্থায় এদেরকে একা ফেলে যাওয়া যায় নাকি ।

–ঠিক আছে, তাহলে তুমি থাকো, আমি একাই যাচ্ছি ।

তিথি বললো ---ভাইয়া, তুমি যাও ।

–কি মুসিবত দ্যাখ দেখি, তখনই বললাম, তোমার যাওয়ার দরকার নেই, শুনলো না, যত্তোসব ..... মা, আমি সন্ধ্যার দিকে একবার আসবো, শফিক তুই কিচ্ছু ভাবিস না, সব ঠিক হয়ে যাবে---চলো, চলো--- ।

বিথী চাপা স্বরে বললো – স্ত্রৈণ, জন্মের স্ত্রৈণ ।

পাঁচ

মাধুরী বাসাবোতে এসে হাজির হবে, আমি কল্পনাও করিনি । সকাল দশটার মতো বাজে । আমি নাস্তা সেরে মলম নিয়ে বসেছি, ডলতে ডলতে গোড়ালির ছালচামড়া উঠে যাবার দশা, বিথী এবং তিথি হাসপাতালে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, এমন সময় দরজায় কড়া নড়ে উঠলো ।

বিথী ভেতরের ঘর থেকে হুকুম করলো---সৈকত ভাই, দেখেন তো কে এলো?

দরজা খুলে মাধুরীকে দেখেই আমার চোখ জোড়া চানাবড়া হয়ে গেলো । ---মাধুরী তুমি!

মাধুরীর মুখে বিষন্ন এক টুকরো হাসি । -কেন, আসতে পারি না?

–না, তা নয় । কিন্তু ঠিকানা পেলে কোথায়?

–তুমি তো দাওনি, তাই চম্পার কাছ থেকে জেনে নিলাম । তুমি কি আমার সাথে একটু বেরুতে পারবে?

—কোথায়?

—যেখানে আমি নিয়ে যাই ।

—না মানে, আমার গোড়ালিতে হেভি ব্যথা, নড়াচড়া করতে পারছি না পর্যন্ত.... ।

—হাটতে হবে না । স্কুটারে যাবো ।

বিথী উৎসুক হয়ে এ ঘরে এলো । ---কে সৈকত ভাই? মেয়ের গলা শুনছি । মাধুরীকে বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখে বললো--কাকে চান আপনি?

মাধুরী খুব মিষ্টি করে হাসলো ।---এইতো একে ।

—সৈকত ভাইকে! ওনার মতো একটা অপগ-ের এতো সুন্দরী বান্ধবী থাকতে পারে ভাবাই যায় না । ভেতরে আসুন না আপনি । আমার নাম বিথী । আপনার?

—মাধুরী ।

—দরজায় দাঁাড়িয়ে আছেন কেন? ভেতরে আসুন ।

—না, আজ নয় । আমার একটা জরুরী কাজ আছে ভাই । এক্ষুনিই যেতে হবে ।

আমাকে তাড়া দিলো, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছো কেন? জলদি তৈরী হয়ে নাও ।

বিথী বললো---মাধুরী আপা, আপনি ভেতরে না এলে আমি কিন্তু খুব রাগ করবো ।

মাধুরী হাসিমুখে বললো---করো । আরেকদিন এসে আমি তোমার রাগ ভাঙ্গিয়ে দিয়ে যাবে ।

আমি দ্রুত হাতে ট্রাউজার পরছিলাম, তিথি কখন ভেতরে ঢুকছে খেয়াল করিনি ।

—মাধুরি আপনি ভেতরে এসে বসুন । নইলে আমরা খুব অপমানিত বোধ করবো ।

মাধুরী সামান্য ইতস্তত করলো, ---এখন ঢুকলে বিথী রাগ করবে না তো?

বিথী সহজ গলায় বললো, ---একটু না । আমার কথা তো কেউই শোনে না, আমি দেখতে কুৎসিত কিনা তাই । আপা সুন্দর, আপার কথা সবাই শোনে ।

—কথাটা কিন্তু একদম ঠিক না । তুমি খুবই সুন্দর । রঙটা চাপা বলে চেহারাটা আরও সুন্দর ফুটেছে ।

আমার বিছানাতেই বসলো মাধুরী ।

বিথী গম্ভীর মুখে বললো---জানেন, আজ পর্যন্ত একটা ছেলেও এই সহজ ব্যাপারটাই ধরতে পারলো না।

মাধুরী খিল খিল করে হেসে উঠলো---যাহ। আমার বিশ্বাস হয় না!

–বিশ্বাস হচ্ছে না? বড়'পাকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখেন।

–তুই থামলি? মাধুরী, এক কাপ চা খেতে নিশ্চয় আপত্তি নেই।

–নাহ।

–ঠিক আছে, আপনি বসুন। আমি চা করে আনছি। বিথী তুই গল্প কর।

বিথীর গল্পের ধরনই আলাদা। সে মুগ্ধ কণ্ঠে বললো। ---ইস মাধুরী আপা, আপনার গায়ের রংটা কি ফর্সা! মাখনের মতো। আমারটা দেখেছেন? কয়লার গুদাম। আচ্ছা মাধুরী আপা, কালো মেয়েদের ফর্সা হবার কোন উপায় আছে?

আমি বললাম---আছে। চুন মেখে দেখতে পার।

চোখ পাকালো---মেয়ে মেয়েতে কথা হচ্ছে। আপনি আবার এর মধ্যে নাক গলাচ্ছেন কেন? এই মাধুরী আপা, সত্যি করে বলেন তো, আছে কোন উপায়?

মাধুরী গাঢ় স্বরে বললো---বিথী কিছু কিছু মেয়ে আছে যাদের কালো রংটাও একটা সম্পদের মতো। তুমি তেমনি একটা মেয়ে, তোমার ফর্সা হবার দরকার নেই।

বিথী হাসতে হাসতে বললো ---মাধুরী আপা, আমি আসলে ঠাট্টা করছিলাম। আমার রংটং নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই।

–তুমি খুব ভালো মেয়ে।

–আরে বাহ। কারো সামনে তার প্রশংসা করতে হয় নাকি?

তিথি চা নিয়ে এলো। চা খেয়েই উঠে পড়লো মাধুরী।

–আজ তাহলে যাই। আপনার নামটা জানা হলো না.....

–তিথি।

–আপনি খুব সুন্দর চা বানান।

–তাই বুঝি? ধন্যবাদ।

—আচ্ছা যাই । বিরক্ত করে গেলাম ।

—একটুও না । মাধুরী, আপনি যখন ইচ্ছে চলে আসবেন । আমরা খুশী হবো ।

আমরা যখন স্কুটারে উঠলাম, মাধুরীর চোখ তখনও ভেজা । খুবই স্বল্প পরিসরে এক রাউ- কেঁদে নিয়েছে ও, আমি অবাক হয়ে জানতে চাইলাম, ---কাঁদছো কেন?

—ওরা আমার সাথে এতো ভালো ব্যবহার করলো?

—ওরা সবার সাথেই ভালো ব্যবহার করে ।

—আচ্ছা ওরা যদি জানে আমি কি, তখনও কি এমন করে ঘরে ডেকে চা খাওয়াবে?

—সবার কথা জানি না তবে যার হাতের চা খেলে তার কাছে তোমার ঐ পরিচয়ের কোন মুল্য নেই ।

—তুমি বুঝলে কি করে?

—বলতে পারবো না । কিন্তু আমার সেই রকমই মনে হয়; যাইহোক, আমরা যাচ্ছি কোথায়?

—আমার বাসায় ।

—কেন?

—আগে চলো । মাধুরী হঠাৎ করেই নিশ্চুপ হয়ে গেল, আমাকেও বাধ্য হয়ে মুখে কুলুপ আঁটতে হলো ।

মাধুরী আমাকে সোজা ওর বেডরুমে নিয়ে এলো ।

—বিছানায় আরাম করে বসো ।

—বাসায় আর কেউ নেই?

—আর কে থাকবে?

—কাজের বুয়াটা?

—ওকে আজ আসতে মানা করেছি ।

—তোমাকে খুব সিরিয়াস মনে হচ্ছে । ব্যাপারটা কি? মাধুরী ড্রেসিং টেবিলের টুলে বসলো । থমথমে মুখ – আচ্ছা সৈকত, সত্যি করে বলতো, আমাকে তুমি ভাবোটা কি?

—মানে!

—তুমি তো কখনো আমার শরীর ছোঁওনি, সুতরাং তোমার কাছে আমি সস্তা কোন কলগার্ল নই। তোমার কাছে আমি শুধু মাধুরী, একজন মাধুরী, যার রুচিবোধ ভালো, যথেষ্ট লেখাপড়া জানে এবং চেহারা সুন্দর। আমি কি ভুল কিছু বলছি সৈকত?

মাধুরীর সাথে আমার সম্পর্কটা বরাবরই খুব বেশী ইয়ার্কিতে ছোঁয়া। ওর কথাবার্তার ধরন দেখে আমি আকাশ থেকে পড়লাম।

—তুমি এভাবে কথা বলছো কেন, মাধুরী? আমি তো তোমাকে কখনো অপমান করিনি।

—করোনি?

—কই নাতো। আমার অত্যন্ত মনে পড়ছে না।

মাধুরী উঠে এসে আমার দু'গালে চটাস চটাস করে খান চারেক চড় কষিয়ে দিলো। ওর ঐ নরম হাতে এতো জোর আছে জানা ছিলো না। গাল দুটো রীতিমতো তেতে উঠলো।

প্যাঁচার মত মুখ করে বললাম,---ঝালটা কি জন্য ঝাড়া হলো জানতে পারি?

—আমার আর আজাদের বাজে বাজে ছবি তুলে আজাদকে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করোনি?

লে হালুয়া! এই খবর-মাধুরীর কানে কে তুললো? সব্বোনাশ আর কাকে বলে! হালে পানি পাওয়া খুব সমস্যার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে, নিঃসন্দেহে।

—কে বললো তোমাকে?

—যেই বলুক কথাটা সত্যি কিনা বলো?

খুকখুক করে বারকতক কাশলাম। ---মাধুরী, আমি শুধু আজাদের কাছ থেকে মোটা অংকের একটা টাকা খসাতে চেয়েছিলাম, আর কিছু না।

—ছবিগুলো কে তুলে ছিলো?

—সাজ্জাদ।

—টাকা পেয়েছো?

—নাহ। সাজ্জাদ বিট্রে করেছে।

– বেশ করেছে। একটা মেয়ে, কলগার্লই হোক আর যাই হোক, তোমাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসে, আর তুমি প্রতিদান দিলে এইভাবে? তাকে নিয়ে ব্যবসা করতে নামলে? তার চেয়ে তুমি আমার প্রাইভেট দালাল হলে না কেন, বিনা পরিশ্রমে হাজার টাকা পেয়ে যেতে।

বুঝলাম, আঘাতটা ওর কোথায় লেগেছে। কিন্তু ঐ ভালবাসা ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাস যোগ্য মনে হলো না। ওর সাথে আমার সহজ বন্ধুত্ব আছে, সেটাকে আমার কাছে অন্তত কখনো ভালবাসা-টাসা মনে হয়নি। তাহলেও ওর জন্য আমার তীব্র অনুভূতি আছে। আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। মাধুরীর মুখেই শুনে ছিলাম, আজাদ খুব কড়া আলো জ্বালিয়ে আনন্দ করে, ব্যস সঙ্গে সঙ্গে প্লানটা ঢুকে গেল মাথায়, আগপাছ কিছু চিন্তা ভাবনা করিনি।

–মাধুরী, আমাকে এবারের মতো ইয়ে করে দাও। আমি আসলে এভাবে ভাবিনি।

–কেন ভাবনি? কেন? তোমার চোখেও কি আমি শুধু একজন বারবনিতা, আর কিছু নই?

–তা কেন হতে যাবে? তুমি আমার বন্ধু, নাজমুল যেমন। তোমার কাজ-টাজ নিয়ে আমি কখনো মাথা ঘামাই না। আমি নিজেও কি এমন সাধু-দরবেশ?

মাধুরীর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে, ও আমার শার্টের কলার চেপে ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললো---কেন, বন্ধু ছাড়া আমাকে আর কিছু ভাবতে পারো না তুমি? আমি এতই জঘন্য? এতই অস্পৃশ্য? তিথি আমার চেয়ে কোন অংশে ভালো? বলো, ও আমার চেয়ে সুন্দরী? আমার মতো ফিগার আছে ওর? আমার মতো হাসতে জানে? ভালোবাসতে জানে? তবুও তুমি ওর প্রেমে পড়বে। কেন?

–মাধুরী, তুমি কি যাতা বলছো?

–লুকিও না সৈকত। মেয়েরা পুরুষদের মন পড়তে পারে। আমিও তোমার চোখ দেখলেই সব বুঝতে পারি। তুমি তিথির প্রেমে পড়েছো। কিন্তু তুমি আমার প্রেমে কেন পড়লে না? কেন?

মাধুরী বেসামাল ভঙ্গিতে পিছিয়ে গিয়ে একটানে শাড়ী, ব্লাউজ খুলে ফেললো। ব্রার হুকে হাত রাখতেই আমি ককিয়ে উঠলাম।

–এসব কি করছো মাধুরী?

–এই সুন্দর শরীরটা রাক্ষসের দল চেটেপুটে খাবে, অথচ তুমি একটিবারের জন্যেও চেখে দেখবে না। তা কেন হবে? সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ালো ও। ---ভালো করে চেখে দেখো কি অঢেল সম্পদ আছে আমার। কুমারীত্বের প্রথম ক্ষণটিতে যেমন ছিলো। আজও ঠিক তেমনি আছে,

দেখ কোথাও কোন ঘাটতি নেই। এই শরীর তোমার, এই মন তোমার, তাহলে তুমি কেন আমাকে গ্রহণ করবে না? আমার কি সংসার পাততে ইচ্ছে হয় না? ভাগ্যের দোষে এই পথে নেমেছি বলে কি ভাল হতে চাওয়াটাও আমার অন্যায়? সৈকত কথা বলছো না কেন? এই সৈকত তুমি কথা বলছ না কেন?

আমি হতবিহবল হয়ে মাধুরীকে দেখি। ওর জন্যে আমার অসহনীয় রকম যন্ত্রণা হতে থাকে। ঐ চমৎকার মুখশ্রীর সযত্ন প্রসাধনীর নীচে এতো ক্ষোভ চাপা ছিলো আমি ঘূর্ণাক্ষরেও কোনদিন টের পাইনি। ওহ মাধুরী! তার এতো কষ্ট, এতো আকুতির কথা সে আমাকে কেন এতদিন বলেনি? আমাকে একি দ্বিধা দ্বন্দ্বে ফেলে দিলো সে? তিথি আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে, তবুও ওকেই আমার ভালবাসতে ইচ্ছে করে, এই ইচ্ছে মহাকর্ষের মতো তীব্র অমোঘ, তাকে আমি কি করে অস্বীকার করবো?

মাধুরী পরম আকুলতায় আমার গলা জড়িয়ে ধরলো। সৈকত, আমরা কি ঘর বাঁধতে পারি না। আমরাতো এমন কোথাও চলে যেতে পারি যেখানে আমাদেরকে কেউ চেনে না জানে না। ধরো দূরের কোন সবুজ শ্যামল গাঁয়ে, আমাদের একখানা কুড়ে ঘর থাকবে, একটা সবজির বাগান থাকবে, কয়েকটা হাঁস-মুরগি থাকবে, আমি উঠোনে চাল ছড়িয়ে ডাকবো "আয় আয়", তুমি উঠোনে বসে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে আমাকে দেখবে---তেমনটা হয় না সৈকত?

আমি কোন কথা বলতে পারি না। এক দুর্বোধ্য দ্বিধা আমার সমস্ত অস্তিত্বকে গ্রাস করে নেয়, আমি চেঁচিয়ে বলতে চাই, হবে মাধুরী, নিশ্চয় হবে, কোন সবুজ শ্যামল গাঁয়ে আমাদের একটি কুঁড়েঘর থাকবে, একটি সবজি বাগান থাকবে.....কিন্তু আশ্চর্য, আমার গলা দিয়ে সামান্য শব্দও বের হয়না, আমার উচ্চাভিলাষী চেতনা হৃদয়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। আমি বিদ্রোহী হয়ে বলতে থাকি, সৈকত কথা বলো। সৈকত, সৈকতরে..... ।

কতক্ষণ কাটলো এভাবে? জানিনা। মাধুরী এক সময় স্বাভাবিক হলো, সহজ হলো, শরীরে খোলস চড়ালো। ওর ঠোঁটের কোণে এক টুকরো উদাসী হাসি।

–সৈকত, আজ না হয় ধরে নাও সবই আমার বিশ্রী এক রসিকতা। জানোইতো আমি ঢঙ করতে খুব পছন্দ করি। তোমার ভাষায়, বিশ্ব ন্যাকা। মাধুরী বেশ জোরে হাসতে লাগলো।

আমি সম্মোহিতের মতো উঠে দাঁড়ালাম। ---আমাকে ক্ষমা করো মাধুরী।

মাধুরী এগিয়ে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো। ---সৈকত, জীবনে আমাকে অনেক যন্ত্রণা দিয়েছো তুমি। কিন্তু এত স্পষ্ট করে ক্ষমা চেলে এই প্রথম। আমার খুব ভাল লাগছে।

ওর ঠোঁটে মায়াবী হাসি।---যাবে। বেশ যাবে। কিন্তু যাবার আগে কথা দাও মাধুরীকে ভুলে যাবে না?

–মাধুরী আমরা আবার আগের মতো বন্ধু হবো।

–বন্ধু? মাধুরী কোমলভাবে হাসলো---তাই হবে। আমরা আবার বন্ধু হবো। আবার তুমি আমাকে চড় মেরে হন্ হন্ করে হেঁটে গিয়েও মোড় থেকে ফিরে এসে মুখ গোমড়া করে দাঁড়াবে। আমি হাসতে হাসতে বলবো – প্রাণেশ্বর, জানতাম তুমি ফিরবে। ওহ, সৈকত, আমার ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে, ভীষণ.....। মাধুরী বিছানায় হুমড়ি খেয়ে অঝোর ধারায় কাঁদতে থাকে। আমি চোরের মতো পালিয়ে আসি। মাধুরী সুন্দরী, মাধুরী ছন্দময়ী, মাধুরী রহস্যময়ী, তবুও সে মাধুরী, তিথি নয়, তিথিদের মতো কেউ নয়। না পালিয়ে আমার উপায় কি? শুধু অতীতের কোন ঝিঁঝি ডাকা রাতে, বাঁশ ঝাড় ফুড়ে ফুড়ে কে এক হতভাগিনী তীব্র ধিক্কার দেয়, সৈকত অ সৈকত, এ তুই কি করলিরে.....।

ছয়

তিন দিনের দিন শফিক বাড়ী এলো। তার সারা শরীরে ব্যা-জ, কিন্তু তাতে তেমন কোন অসুবিধা আছে বলে মনে হলো না। সে ঘরে ফিরেই ইতির সাথে দু'একটি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মহা উৎসাহে ঝগড়া করলো, বিথীর গোলাপ গাছে ডজন খানেক গোলাপ ফুটেছিলো, সেগুলো ছিঁড়ে রীতিমতন হৈ-চৈ কা- বাধিয়ে দিলো এবং সবাইকে কিছুক্ষণ পরপরই উদাত্ত কণ্ঠে স্মরণ করিয়ে দিলো, ব্যা-জ খোলা হলেই সে চারজনকে পরপারে পাঠিয়ে দিচ্ছে। রীতাকে অবশ্য আবার চার নম্বরে পাঠানো হয়েছে। সব মিলিয়ে এলাহি কা-।

আমার গোড়ালির ব্যথা খানিকটা কমতে আমি সাকুরায় গেলাম রাইসুলের সাথে দেখা করতে।

—সৈকত ভাই যে, বেশ ক'দিন কোন খোঁজ খবর নেই। ব্যাপার কি?

—অন্যদিকে একটু ঝামেলা ছিলো। তোমার খবর কি?

—সাজ্জাদদের খোঁজ পেয়েছি। খুলনার দিকে গেছে। সীমান্ত পেরিয়ে পালানোর চেষ্টা করবে বোধ হয়। আমি আজ রাতের বাসেই রওনা দিচ্ছি। আমাকে ক্ষেপিয়েছে ব্যাটা, ওকে আমি জ্যান্ত ছাড়ছি না। আপনিও যাবেন নাকি আমার সাথে?

—নাহ, ঐ মোহ ছুটে গেছে! টাকাটা যদি পাও সবটাই তোমার।

রাইসুল নিঃশব্দে হাসলো। ---আপনি ভেবেছেন এসব আমি টাকার জন্য করছি? আসলে তা নয়। ব্যাটারা আমার হাতের ফাঁক গলে পালিয়ে গেলো, আমার খুব অপমান হলো। একটা সুনামের ব্যাপার আছে না! বলতে পারেন, এটা একটা পার্সোনাল চ্যালেঞ্জ।

—নাজমুল আমাকে সেরকমই বলেছিলো। তবুও ভাবলাম একবার নিজেই খবরটা নিয়ে যাই।

—ভালো করেছেন।

—আমি যাই রাইসুল।

—সৈকত ভাই, রাইসুল বেশ নরম গলায় ডাকলো, আপনাকে একটা খবর দেয়া দরকার। মাধুরী আপা রাতদিন মদ নিয়ে পড়ে থাকে। তার কি হয়েছে আমি জানি না। জানতেও চাইনি। তবে এতোটা বাড়াবাড়ি করতে মানা করেছিলাম, ও আমাকে মদের বোতল নিয়ে তাড়া করলো, সময় মতো সটকে না পড়লে মাথাটা নির্ঘাৎ দু'ফাঁক করে দিতো। আপনার সাথে তো বেশ খাতির, একবার গিয়ে চেষ্টা করবেন নাকি?

—আমি গিয়ে কি করবো? ওতো আমার কথা শোনে না।

—তবুও একবার যাবেন। ও আপনার কথা বলছিলো।

—কি বলছিলো?

—সেটা আর নাইবা শুনলেন। আমার মনে হয় আপনার একবার যাওয়া উচিৎ।

—দেখি।

আমি চলে এলাম। সেই খারাপ লাগাটা আবার আমাকে গ্রাস করতে শুরু করলো। মাধুরীর জন্য আমার আর কিইবা করার আছে? ওর সামনে আমি কোন মুখে গিয়ে দাঁড়াবো? এতো কিছুর পরেও কি বলা সম্ভব — মাধুরী, তুমি আর ওসব খেয়ো না। আমার এই একটা কথা শোন! তা আর হয় না। হবার নয়। আমি মাধুরীর কাছে গেলাম না। নির্জন রমনা লেকের অন্ধকার তীরে বসে অজস্রবার ক্ষমা চাইলাম ওর কাছে। ওর মুখোমুখি হবার সাহস হলো না।

রাতে তিথিকে দরজা খুলতে দেখে ভীষণ অবাক হলাম।

—বিথী কোথায়?

—ওর এক বান্ধবীর বিয়ে। তারা এসে নিয়ে গেছে ওকে। যাবার আগে আমাকে অন্তত দশবার বলে গেছে। আপনার ফিরতে রাত হবে, আমি যেন জেগে থাকি।

—বেশ অন্যায় হয়ে গেলো। আপনাকে খামাখা অনেকক্ষণ জাগিয়ে রাখলাম।

—একেবারে খামাখা নয় অবশ্য। আমি পরীক্ষার খাতা দেখছিলাম।---লক্ষ্য করলাম টেবিলে আমার ভাত-টাত সব সাজিয়ে রাখা।

—বিথী ঠিকঠাক করে রেখে গেছে। আপনার জন্য ওর খুব ফিলিংস। ভাইয়া যখন ছিলো তখন ওকেও খুব যত্নআত্যি করতো বিথী। বড় ভাই বলতে অজ্ঞান ছিলো।

আমি মৃদু হাসলাম।---ওর মতো মেয়েরা আছে বলেই আমার মতো অকাল কুষ্মান্ডেরা একটু আধটু ভালোবাসা পায়। নইলে আমরা কবেই ঝরে যেতাম।

—যাহ, আপনার তো মাধুরী আছে। এতো সুন্দর মেয়ে আমি খুব কম দেখেছি। ব্যবহারও চমৎকার। ওকে আপনি বিয়ে করেন না কেন?

আমার হৃদয় কেঁপে উঠলো। শুকনো ভাবে বললাম---ও আসলে আমার বন্ধুর মতো। আমাদের মধ্যে চড় থাপ্পড়ের সম্পর্ক।

—তাই বুঝি!

—হ্যাঁ। অনেকদিনের পরিচয় তো। প্রায় সাত আট বছরের!

—মাধুরী আপনাকে কখনও কিছু বলেনি?

—কি বলবে?

—বলেনি ও আপনাকে ভালোবাসে?

—তা বলবে কেন!

—তাতো বলতে পারবো না। তবে ও আপনাকে ভালোবাসে। এটা আমি ঠিকই বুঝেছি। থাক ওসব কথা। আপনি খেয়ে নিন।

আমার মনটা খারাপ হয়ে গেলো। তিথি কি সর্বজ্ঞ? ও কি করে মাধুরীর মনের কথা পড়লো? খাওয়ার রুচি নষ্ট হয়ে গেছে, তবুও খেতে হলো। আমার কোন ব্যবহারে এরা আঘাত পাক, আমি তা চাই না। ভেতরের ঘর থেকে কাগজ নাড়ার খস্ খস্ শব্দ আসছে, তিথি খাতা দেখছে। আমি বারান্দায় এসে একটা সিগারেট ধরালাম। মানুষের অন্তরের চেয়ে অদ্ভুৎ আর কি আছে এই পৃথিবীতে? যে তার সমস্ত অস্তিত্ব নিয়ে আমার কাছে সমর্পণ করতে চাইলো আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম; আর যার হৃদয়ে আমার কোন দিনও স্থান হবে না, যে আমার ধরা ছোঁয়ার বাইরে, তাকেই পাবার জন্য মন আকুল হয়ে ওঠে। কেন এমন হয়?

○ ○ ○ ○ ○

তখন দুপুর। ভর দুপুর। কি প্রচ- রোদ চারদিকে, ব্রক্ষতালু পর্যন্ত গরম হয়ে ওঠে। সিরাজ সাহেব অলস ভঙ্গিতে চেয়ারে পা তুলে বসে ঝিমুচ্ছিলেন, তার শরীরটা যেন মাত্র এই কদিনেই অনেকটা ভেঙে পড়েছে। কেমন বুড়ো বুড়ো দেখাচ্ছে।

—সিরাজ সাহেব।

তিনি চোখ খুলে আমাকে দেখেই হাসলেন। কি অন্তরঙ্গ হাসি!

—আসুন বাবা, আসুন, আপনি তো আর আমাদের বাসায় আসেনই না। চম্পা আপনার কথা খুব বলে। বসুন, বাবা।

—আপনার শরীরটা খারাপ মনে হচ্ছে ।

—নাহ, বাবা । খারাপ আর কোথায়? বয়েস হচ্ছে তো একটু একটু করে ভেঙে পড়ছে । তাছাড়া ব্যবসার চাপও কম না । এক হাতে আর কতো সামলাবো । আপনার কাজকর্ম কেমন চলছে?

—ভালো না সিরাজ সাহেব । আমি খুব অসুবিধার মধ্যে আছি ।

—কেন, কেন? ঐ বাসায় কি আপনার কোন অসুবিধা হচ্ছে? ওরা কি খারাপ ব্যবহার করছে?

—না না, ওরা সবাই খুব ভালো ।

সিরাজ সাহেব স্বস্তির নিস্বাস ছাড়লেন । ---তাই বলুন । ওরা আছে কেমন? শফিকের ব্যা-জ খুলেছে? তিথি মাঝে মাঝে বাসায় আসতো আগে, এখন আর আসে-টাসে না । বড় দূরে দূরে সরে যাচ্ছি আমরা সবাই, নিজেদের কাছে বডডো অপরিচিত হয়ে যাচ্ছি ।

—আপনি দুঃশ্চিন্তা করবেন না, সিরাজ সাহেব । ওরা সবাই ভালো আছে । শফিকের ব্যা-জ আগামী সপ্তাহে খুলবে । আর তিথি স্কুলের কাজে খুব ব্যস্ত সেজন্যেই বোধ হয় আসার সময় পায় না ।

—যাক, বাঁচালেন, বাবা । বড় চিন্তায় ছিলাম । টাকা পয়সা নিয়ে ওদের কোন ঝামেলা হচ্ছে নাতো?

—দেখে তো মনে হয় না ।

—যদি হয় তাহলে আমাকে দয়া করে একটু জানাবেন! ওরা তো মুখ ফুটে কোনদিনই বলবে না । দিলেও নেবে না । আমার তিথি মা বিদুষী মেয়ে । তার আত্মসম্মান খুব বেশী । আমি তার সাথে এইসব কথা বলতে পারি না । আপনার কাছে অনুরোধ থাকলো, বাবা, ওদের তেমন কোন বিপদ হলে আপনি আমাকে জানাবেন । পারবেন না, বাবা?

—সিরাজ সাহেব, আপনাদের সাথে ওদের কিসের শত্রুতা? চম্পার সাথে ওরা কেন খারাপ ব্যবহার করে?

সিরাজ সাহেব ভাঙাস্বরে বললেন — জানতে চাইবেন না, বাবা । আমি সেসব কথা আপনাকে বলতে পারবো না । সেদিন আপনি রহস্যের কথা বলেছিলেন । রহস্য সত্যিই একটা আছে, বাবা । সে কাহিনী খুবই নোঙরা । নাইবা শুনলেন সেসব ।

আমি বেশ অপ্রতিভ হয়ে পড়লাম ।---সিরাজ সাহেব, আমি আপনাকে দুঃখ দেবার জন্য কিছু বলিনি । আপনি আমার কথায় কিছু মনে করবেন না ।

—না না বাবা, আপনার কথায় আমি কিছু মনে করি না। আমার কোন ছেলে নেই, আপনি আমার ছেলের মতো। এই কে আছিস, একটা ঠা-া দেখে কোকা কোলা নিয়ে আয়।

—না সিরাজ সাহেব, আমি এখন কিছু খাবো না। আসলে আমি আপনার কাছে একটা কাজে এসেছিলাম।

—লজ্জা করবেন না, বাবা, কি দরকার?

—সিরাজ সাহেব, আমাকে একটা কাজ দিন। যে কোন ধরনের কাজ।

উনি খুব একটা আশ্চর্য হলেন না। ---আপনার কাজটা কি হলো, বাবা? ছেড়ে দিয়েছেন?

—আমি আগে কোন নির্দিষ্ট কাজ করতাম না। অনেকটা টাউট ধরনের ছিলাম। ওসব আমার আর ভালো লাগছে না, সিরাজ সাহেব। আমি অন্য কিছু করতে চাই।

সিরাজের চোখে মুখে অদ্ভুৎ এক দীপ্তি ছেয়ে গেলো, আমার ডান হাত খানা নিজের দুহাতে চেপে ধরে আবেগ কম্পিত স্বরে বললেন---আল্লাহ পাক আপনার দিলে রহমত বর্ষণ করুন। আমি আপনাকে কাজ দেবো, বাবা। অবশ্যই দেবো, আপনি আমার ম্যানেজার হবেন। আপনার উপর সম্পূর্ণ আস্থা আছে। আমি জানি আপনি আমার ছেলের অভাব পূরণ করবেন।

এই সৌভাগ্য কি আমার আঠারো বছরের প্রাণান্ত লড়াইয়ের উপহার? নাকি স্রষ্টা নামক কোন বিশ্বাসের কৃপা? আমার কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এলো, এক ঝাঁক সুখের কপোতেরা যেন ঝাঁক বেঁধে উড়ে যেতে চাইলো, চোখের কোণে ভেজা ভেজা স্পর্শ। কি লজ্জার কথা। আমি দ্রুত উঠে পড়লাম।---সিরাজ সাহেব, আপনার কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ থাকবো।

সিরাজ সাহেব মৃদু হেসে বললেন---বাবা, আপনাকে দেখে বোঝা যায় না, আপনি এতো আবেগপ্রবণ মানুষ। কাল সকাল নয়টায় এখানে চলে আসুন। আমি আপনাকে সব কাজ বুঝিয়ে দেবো। আর একটা কথা বাবা, ও বাসায় এ ব্যাপারে কিছু বলবেন না যেন। আপনার ভালোর জন্যেই বলছি।

আমি হ্যাঁ সুচক ঘাড় নেড়েই দ্রুত সরে এলাম। আমার এখন নির্জন কোথাও বসে আপন মনে একটা সিগারেট টানা দরকার।

○ ○ ○ ○ ○

নাজমুল আমাকে দেখে চোখে চৌদ্দ খানা ভাঁজ ফুটিয়ে তুললো।---এই শালা, তুই বারবার আমাকে জ্বালাতে আসিস কেন বলতো? খেয়ে দেয়ে আর কোন কাজ নেই তোর?

বুঝলাম, নাজমুলের মন ভালো হয়ে গেছে। উদাস উদাস ভাব কেটে গেছে। ওর হাতে আমি এক প্যাকেট বেনসন ধরিয়ে দিলাম।---তোর জন্যে।

অবিশ্বাস নিয়ে প্যাকেটটা খুলে দেখলো ও। হাউস ফুল দেখে আশ্বস্ত হলো। ---মতলব কি তোর? হঠাৎ উপঢৌকন দেয়া হচ্ছে যে বড়!

—চাকরি পেলাম। তাই ভাবলাম আমার প্রাণের শত্রু যখন একটা আছেই, তখন সেটাকেই খানিকটা বিষ কিনে দিয়ে আসি। তারপর, তোর দরবেশগিরির কত দূর?

নাজমুল আয়েশ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললো---দু'তিন দিনের মধ্যেই রওনা দিচ্ছি।

—কি। তুই সত্যি সত্যি যাচ্ছিস নাকি?

—সত্যি সত্যিই যাচ্ছি। দু'জন পাটনারও পেয়ে গেছি।

—কোথায় যাবি? হিমালয়ে?

—হিমালয়ে? হয় তো। এখনও কিছু ঠিক করি নি।

—হেঁয়ালি ছাড় বাপ। ঘটনা কি খুলে বল।

—ঘটনা আবার কি হবে? বলেছিলাম সন্ন্যাসী হবো, হচ্ছি।

—তোর পার্টনার কে কে?

—তুই চিনবি না।

—ফিরবি কবে?

—কে জানে? হয় তো ফিরবই না। যাযাবরের মতো দেশ থেকে দেশে ঘুরে বেড়াবো।

আমার খুব খারাপ লাগছে। নাজমুল চলে গেলে আমার আর কোন বন্ধু থাকবে না। আমি বড় নিঃসঙ্গ হয়ে যাবো। কিন্তু নাজমুলকে সে কথা বলা যায় না। আমাদের দু'জনার কথাবার্তায় এই সব ঠুনকো আবেগের কোন স্থান নেই।

আমি বেশ ফুর্তির ভাব ফুটিয়ে বললাম- চল শালা, তোকে তাহলে আখেরি খানাটা খাইয়ে দেই।

—চাকরি পেয়েতো খুব ড্যাং ড্যাং করে নাচছিস দেখি। কি এমন লাউ-কদু চাকরি পেয়েছিস শুনি?

–সেসব শুনে তুই কি করবি? খাবি তো চল । নইলে আমি চললাম ।

–শালা । একবেলা একটু খাওয়াবি বলে অতো চড়ং চড়ং বুলি ছাড়ছিস কেন? চল, চল ।

আমরা দুজন অনেক রাত পর্যন্ত একসাথে থাকলাম । খেলাম, সিনেমা দেখলাম, সামান্য জুয়াও খেললাম, কিছু পরিমাণ মদও টানলাম এবং দু'জনই কিছুক্ষণ পরপর জানান দিলাম-শালার সময়টাই নষ্ট করছি, তোর সাথে থাকার চেয়ে পায়খানায় গিয়ে বসে থাকাও ভালো.... । বিদায়ের সময় আমি নাজমুলের নিতম্বে ধাই করে একটা লাথি বসিয়ে দিলাম । ---যাও, দরবেশ বাবাজি, দেখি কতো কৃচ্ছ তুমি সাধন করো । ধড়মচ-ী গোগর্দভ, আমার পকেটটাই ফাঁকা করে দিলো ।

নাজমুল অনেকখানি পথ পিছু ধাওয়া করে এলো পালটা লাথি মারবে বলে । ব্যর্থ হয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে উঁচু গলায় খানকতক অকথ্য গালি দিলো । আমি বিকট শব্দে হাসতে হাসতে বাসে চাপলাম । দুদিন বাদে জানলাম, নাজমূল সত্যিই চলে গেছে ।

○ ○ ○ ○ ○

শফিকের যেদিন ব্যা-জ খোলা হলো সেদিন রাতেই দুটি ছেলেকে ছুরি মেরে সে উধাও হয়ে গেলো । ছেলে দুটির পিতারা প্রভাবশালী মানুষ । তারা হুলস্থুল কা- বাঁধিয়ে দিলেন । থানায় কেস হলো, পুলিশ বাসায় এসে সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গেলো । গলিপথে সাদা পোশাকধারী একজন পুলিশ কনেষ্টবল সার্বক্ষণিক প্রহরায় থাকলো, শফিক এদিকে এলেই তাকে খপ্ করে ধরে ফেলা হবে ।

বাসায় থমথমে পরিবেশ । খালাম্মা শুকনো মুখে অধিকাংশ সময়ই জায়নামাজে বসে থাকেন । ইতি খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করেছে, নতুন কেউ এলেই সাথী কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞেস করে – ছোট ভাইয়া কি খুন করেছে? তিথি বরাবরের মতই গম্ভীর, দুতিনদিন নিরাপত্তার জন্য স্কুলে যায়নি, আবার নিয়মিত যেতে শুরু করেছে । একমাত্র বিথীকেই বেশ সন্তুষ্ট মনে হয় । যেন শফিক এই ধরনের একটা কাজ না করলেই সে মনঃক্ষুণ্ন হতো । আমি অবাক হলাম না । শফিক যে প্রতিশোধ নিতে পেরেছে সেটাই বিথীর কাছে সুখকর, বাকীটুকু সে ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না ।

সিরাজ সাহেব মরিয়া হয়ে ছুটোছুটি করছেন । শফিকের কেসটা কিভাবে ডিসমিস করা যায় তাই নিয়ে সম্ভাব্য সবার সাথেই আলাপ আলোচনা করেন । ইতিমধ্যেই প্রচুর টাকা-পয়সাও ঢেলেছেন । তার আশা এতে কাজ হবে! সব ভালোয় ভালোয় মিটে যাবে । আমি একটু বোকা বনে গেছি । আমার ধারণা ছিলো শফিকের চোয়ালটাই প্রধান । কিন্তু দেখা যাচ্ছে শফিক যা বলে তার কিছুটা অন্তত করে । সিরাজ সাহেবকে কি সাবধান করে দেয়া উচিৎ, তিন নম্বরে তো তারই থাকার কথা ।

অলস দুপুর, আমি বসে বসে টাকা-পয়সার হিসাব মিলিয়ে দেখছি শফিক দোকানে ঢুকলো একগাল হাসি নিয়ে। স্পষ্ট কৃতিত্বের হাসি।

–কি খবর সৈকত ভাই কেমন আছেন?

–এক থাপ্পড় মেরে তোমার সব কটা দাঁত ফেলে দেয়া উচিৎ।

শফিক হাঃ হাঃ করে হাসতে লাগলো। ---বাসায় খুর ঝামেলা হয়েছে নাকি? পুলিশ গিয়েছিলো?

–পুরো এক ব্যাটেলিয়ন। তুমি যে এমন অর্বাচীন তোমাকে দেখে আমি সেটা ঘুনাক্ষরেও বুঝতে পারিনি।

–আরে বাহ আমার দোষটা কোথায় দেখলেন। ঐ শালারা দল বেঁধে আমাকে মারলো, আমি তার শোধ না নিলে মান-সম্মান বলে আমার আর কিছু থাকবে? আপনিই বলুন।

–আচ্ছা! আর এখন যে পুলিশ গিয়ে তোমার মা-বোনদের নিয়ে টানাটানি করছে তাতে সম্মানটা খুব বাড়ছে?

শফিক একটু নিষ্প্রভ হয়ে গেলো। মাথা চুলকে বললো---এই ব্যাপারটা আমি ঠিক চিন্তা করিনি। কাউকে অপমান করেছে নাকি?

–বাসায় পুলিশ যাওয়াইতো একটা অপমান। খালাম্মাতো তার পর থেকেই অন্য রকম হয়ে গেছেন। রাতদিন নামাজ পড়ছেন। ইতিটাও খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করেছে। তোমাদের মতো ছেলেদের যদি কোন কা-জ্ঞান থাকতো।

–বডডো ভুল হয়ে গেছে সৈকত ভাই। আরেকটু প্ল্যাট-ট্যান করে মারা উচিৎ ছিলো। কিন্তু সবাইকে যে বলে রেখেছিলাম সেরে উঠেই মারবো। সেজন্যেই না..... আচ্ছা ইয়ে ও দুটোর অবস্থা কি? মরে টরে যাবেনাতো?

–তা মরবে না। আঘাত তেমন মারাত্মক নয়।

–যাক, বাঁচা গেলো। মরে টরে গেলে বড় খারাপ লাগতো। হাজার হোক ন্যাংটা কালের দোস্ত। আচ্ছা সৈকত ভাই। আপনার কাছে কিছু টাকা হবে? কাছে যা ছিলো সব ফুড়ুৎ হয়ে গেছে। দেখে শুনেতো মনে হচ্ছে এখনও বেশ কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে।

ক্যাশ থেকে শ' পাঁচেক টাকা দিয়ে দিলাম।---একটু বুঝে শুনে খরচ করো, আর ভুলেও বাসায় যেও না। পুলিশের লোক রয়েছে। আরও কটা দিন কোন রকমে কাটিয়ে দাও, সিরাজ সাহেব একটা ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছেন।

—সিরাজ হারামি? আরে শালা, ওর কথাতো ভুলেই গিয়েছি। ওতো তিন নম্বরে....

—খবরদার শফিক, খবরদার.....

শফিক হাসতে হাসতে বললো---বাসায় বলবেন আমি খুব ভালো আছি। বিথী আপাকে বলবেন ওর জন্য একটা পাত্র দেখেছি, কালো কুচ্ছিৎ, ঘটোৎকোচমার্কা....

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লাম। বড় খারাপ বয়েস। এই বয়সে জীবনটাকে এতো হাল্কা মনে হয়!

সাত

বাসায় ফিরলাম সন্ধ্যায়। সবকিছু শুনে খালাম্মা একটা চাপা নিঃশ্বাস ছেড়ে নামাজ পড়তে গেলেন। ইতি চোখ মুছতে মুছতে বললো---মহা হারামি। আস্ত বজ্জাত! কেন যে ওর মতো একটা শয়তানের যমজ হলাম!

তিথি থমথমে মুখে বললো---পাজিটাকে কানে ধরে বাসায় নিয়ে এলেন না কেন? একটু হাতের সুখ করে নিতাম। এতো বয়স হয়েছে এখনও এতোটুকু বুদ্ধিশুদ্ধি হয়নি।

—এই আপদটা কেটে যাক, দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে, ফাঁড়া না এলে কারুরই বুদ্ধি খোলে না।

—ওর আর বুদ্ধি খুলেছে। বিয়ের আগে মা-বোনদের জ্বালাচ্ছে, বিয়ের পর বৌ-শাশুড়িকে জ্বালাবে। ওর হাড়ে হাড়ে বাঁদরামি।

আমি হেসে ফেললাম। বিথী পাত্রের বর্ণনা শুনে হাসতে হাসতে বললো---ওর ধারণা কালো মেয়েদের ফর্সা বর জোটে না। আমিও ঠিক করেছি একটা ইংরেজ মেথরকে বিয়ে করবো। আর কিছু না হোক, গায়ের রঙটাতো ধবধবে সাদা হবে।

ইতি কড়া গলায় বললো---তোর যা ঢং। কাজল ভাই কি অদ্ভুৎ ফর্সা ছিলো, দেখতেও কত সুন্দর, বছরখানেক তোর পেছনে কি ঘোরাটাই না ঘুরলো, তখনতো তুই খুব নাক উঁচিয়ে ঘুরে বেড়াতিস। তোর কপালে মেথর ছাড়া আর কি জুটবে!

—দ্যাখ ইতি, কথাবার্তা একটু সামলে বলবি। কাজলকে তোর যদি এতই পছন্দ হয় তাহলে তুই নিজেই প্রেম করলি না কেন?

—কাজল ভাই আমাকে পছন্দ করতো না, তোকে করতো।

তিথি ধমক দিলো---থামবি তোরা? রাতদিন এতো ঝগড়াঝাটি করিস তবুও তোদের সখ মেটে না? ইতি, সাথী, যাও পড়তে বসো।

ইতি, সাথী চুপ করে বসে থাকলো, তাদের মধ্যে উঠার কোন লক্ষণ দেখা গেলো না। ভেবেছিলাম তিথি রেগে যাবে। তিথি রাগলো না। দুজনার উপর বিরক্ত দৃষ্টি বুলিয়ে আমাকে বললো –সৈকত ভাই, আমার সাথে এক জায়গায় যাবেন? বেশী দূরে নয়। কাছেই।

তিথি দরজার সামনে এসে ঘুরে দাঁড়ালো –ইতি, আমার কথা শুনতে যদি তোমাদের খারাপ লাগে তাহলে বলে দিও, আমি তোমাদেরকে কখনও কিছুই করতে বলবো না।

ইতি নিঃশব্দে উঠে গেলো। সাথী আদুরে গলায় বললো –আমিও তোমাদের সাথে আসব বড়পা?

–না, তুমি পড়তে যাচ্ছো?

–যাচ্ছি ভাই যাচ্ছি, অতো রাগ করছো কেন?

তিথি মুখে আঁচল চেপে বেরিয়ে এলো। ---এই পাজিটার সাথে শাসন চলে না। এমন মজার ঢঙে কথা বলে যে হাসি চাপা দায়।

○ ○ ○ ○ ○

প্রায় অন্ধকার গলি পেরিয়ে ডানের বিশাল দোতালা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালাম আমরা। দারোয়ান তিথিকে দেখেই গেট খুলে দিলো- আসেন, আপামনি।

–চাচা বাসায় আছেন, সাত্তার?

–জি আছেন। একটু আগে এসেছেন। ভেতরে চলে যান আপামনি।

ড্রয়িং রুমে একজন সুদর্শন যুবক বসেছিলেন, তিথিকে দেখেই তার দৃষ্টিতে গভীর বিস্ময় ফুটে উঠলো।

–তিথি, তুমি। এসো, এসো। ইনি?

–আমাদের পেয়িং গেস্ট। সৈকত আলী।

–ও আচ্ছা। মিঃ সৈকত, আমি রাজীব চৌধুরী। আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুবই খুশী হলাম। বসুন।

আমরা বসলাম। তিথির মুখে খুবই সুদর্শন এক টুকরো হাসি – কেমন আছো রাজীব?

–ভালো না, তিথি।

–রাগ পড়েছে?

–পড়েছে। তোমার?

—না। নিতান্ত বাধ্য না হলে এ পথ মাড়াতামই না।

রাজীব একখানি কৃত্রিম দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লো---জানি তুমি খুব নির্মম। সম্ভবত নারী মাত্রই নির্মম। সৈকত সাহেব, আপনি কি বলেন?

আমি বোকার মতো হাসতে লাগলাম,---দেখেন রাজীব সাহেব, আমি মেয়েদের একদম বুঝি না।

—আপনার কি ধারণা আমিও খুব বুঝি? আদৌ নয়। আপনার এই বাড়ীওয়ালার সাথে আমার পাক্কা দেড় মাস পরে সাক্ষাৎ হলো। এই পথে গেলে এই হতভাগার সাথে দেখা হবে তাই তিনি গত দেড়টি মাস এই পথেই হাঁটেন নি। আধ মাইল ঘুরে স্কুলে গেছেন। নারী কত নিমর্ম, বুঝতে পারছেন?

—তুমি চুপ করবে? ওকে অযথা অস্বস্তিতে ফেলছো কেন?

—উনি মোটেই অস্বঃস্তি বোধ করছেন না। কি সৈকত সাহেব, আপনার কি খারাপ লাগছে?

—আমার খুবই ভালো লাগছে। তবে আমার মনে হচ্ছে আপনাদের এখন কিছুক্ষণ একা থাকতে দেয়া উচিৎ। যদি আপত্তি না করেন তো.....।

—সৈকত ভাই, আপনি বসুন তো। আমি এখানে পুরানো প্রেম ঝালাই করতে আসিনি।

—তবে কি জন্যে আসা হয়েছে জানতে পারি, মহারাণী?

—সজীবের অবস্থা কেমন। বাসায় এনেছো ওকে?

রাজীব হাসতে লাগলো। ---শফিকটার কোন আক্কেল নেই, মারবিই যখন আমাকেই মার। একজন দুঃশ্চিন্তায় ছুটতে ছুটতে আসতো, হয়তো মাথায় টাথায় হাত বুলিয়ে দিতো, জনম সার্থক হতো।

—ঠাট্টা রাখ তো। কেমন আছে সজীব?

—বেশ ভালো। বাসাতেই আছে। ডাকবো?

—না থাক। ওর কাছে মুখ দেখাতে পারবো না আমি। এটাই আগে শফিককে মেরেছিলো। সবকটা একই গোয়ালের গরু। রাজীব, তোমার কাছে একটা অনুরোধ আছে। ইচ্ছে ছিলো কথাটা চাচাকেই বলবো, কিন্তু তোমাকে যখন পেয়েই গেলাম.....

রাজীব সারে-ারের ভঙ্গিতে দু'হাত তুললো।---বলো না, বলো না, প্রিয়ে। আমি তোমার চোখ দেখেই ভাষা পড়ে নিয়েছি। কোন চিন্তা করো না। এভরিথিং উইল বি অল রাইট।

—সত্যি সত্যিই কেসটা উইথড্র করবে তো?

—কেস উইথড্র করবো কে বললো? আমি তো আরেকটা নতুন কেস ঠোকার কথা ভাবছিলাম। অভিযোগ, হৃদয় চুরি এবং তাহা লইয়া ছিনিমিনি খেলা।

—তুমি এতো ঠাট্টা মশকরা কোথেকে শিখলে? আগে তো কাগজের মতো শুকনো ছিলে।

—হ্যাঁ, তাতো বলবেই। তুমিতো আমার মধ্যে কখনই কোন গুণ দেখোনা।

—বাদ দাও ওসব। তোমরা কাইন্ডলি কেসটা তুলে নাও। শফিক বাড়ী ফিরলে আমি ওকে কান ধরে টেনে এনে তোমাদের সবার কাছে মাফ চাইয়ে নেবো।

—কখনো না। আমার শ্যালকের এতো বড় অপমান আমি সহ্য করবো না।

—বাজে কথা বলো না। সৈকত ভাই, চলুন যাই। রাজীব, চাচা-চাচীকে আমার সালাম দিও।

—তুমি নিজেই দিয়ে যাও না। ডেকে দিচ্ছি।

—না না। এইসব ঘটনার পর ওদের সামনে যেতে আমার কেমন যেন লাগছে। আচ্ছা, যাই।

—তিথি!

—কি হলো?

রাজীব মাথা চুলকালো।--- আমাকে ক্ষমা চাওয়ার একটা সুযোগ দেয়া উচিৎ।

—এতোদিন যখন তার দরকার হয়নি, তখন আর সে প্রশ্ন উঠছে কেন?

—এতোদিন সাহস হয়নি। তুমি যা রিজার্ভড।

—তুমি খুব ন্যাকা হয়েছো।

—কাল স্কুলে আসবো?

—খবরদার না।

—প্লিজ।

—বারোটার পরে তাহলে।

গলিতে নেমে তিথি সরস গলায় বললো---সৈকত ভাইয়ের নিশ্চয় খুব রাগ হচ্ছিলো?

আমার বুক কেঁপে উঠলো। এই কথার অর্থ কি?---নাতো রাগ হবে কেন?

—আপনাকে বসিয়ে রেখে আমরা কি সব কথাবার্তা বলছিলাম ।

—আপনাদের কথাবার্তা আমার খুব ভাল লাগছিলো । মি: রাজীব বেশ চমৎকার মানুষ ।

—এত অল্প সময়ে মানুষকে বিচার করতে নেই, সৈকত ভাই । তাহলে খুব ঠকতে হয় ।

—কেন, উনি কি ভালো মানুষ নন?

তিথি হেসে উঠলো---আপনি সত্যিই ছেলে মানুষ । আমি কি রাজীবকে খারাপ বলেছি? আমি বলেছি অল্প একটু পরিচয়েই কে চমৎকার আর কে চমৎকার নয় তা ঠিক করে ফেলা উচিৎ নয় ।

—তা ঠিক বলেছেন । মানুষকে বোঝা খুব শক্ত ।

—সৈকত ভাই ।

—কি?

—আপনাকে একটা কথা বলি । কিছু মনে করবেন না, ঠিক আছে?

—বলুন না ।

—সহজ কোন সমস্যাকে জটিল করে দেখা উচিৎ নয় । মাধুরী আপনাকে ভালোবাসে, আমি জানি । আপনি বুঝতে পারেননি কারণ নিজের থেকে সব বোঝার ক্ষমতা আপনার নেই । আপনার উচিৎ মাধুরীর সাথে এ ব্যাপারে কথা বলা ।

আমার গলা ভারী হয়ে এলো । তিথিকে আমি কি করে সেসব কথা বলবো? মাধুরী কি গভীর আকুলতায় আমাকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিলো । আমি নিষ্ঠুরের মতো তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি । অথচ আমি জানি, মাধুরীকে আমিও ভালবাসি । তিথিকে নয়, তিথির মতো কাউকে নয়, আমি ভালোবাসি মাধুরীকে, শুধু মাধুরীকে । অথচ এখন আর ফিরে যাওয়া যায় না, ফিরে যাওয়ার কোন পথই নেই । আমি তিথিকে কিছুই বললাম না, নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলাম ।

○ ○ ○ ○ ○

পরদিন এক রকম ঘোরের মধ্যেই সাঈদার বাসায় গেলাম । সাঈদা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেলো ।

—সৈকত ভাই, আপনি?

—সাঈদা, মাধুরী কোথায়? ওর বাসায় দেখলাম বিশাল তালা ঝুলছে । একজনকে জিজ্ঞেস করে জানলাম প্রায় তিন চারদিন ধরে মাধুরী বাসায় ফিরে না । ব্যাপার কি?

–সৈকত ভাই, ভেতরে আসুন। আমি আপনার জন্যে চা বানিয়ে আনছি।

–না সাঈদা। মাধুরীর সাথে আমার দেখা করা খুবই দরকার।

–ও ঢাকায় নেই।

–তাহলে?

–চিটাগাং গেছে।

–একা?

সাঈদা ইতস্ততঃ করে বললো – না। তালুকদারের সাথে।

–কি? তালুকদার?

–হ্যাঁ, সৈকত ভাই।

আমার সমস্ত শরীর রাগে রি রি করে কাঁপতে লাগলো। এই তালুকদার হারামজাদাই মাধুরীর জীবনটাকে নষ্ট করেছে। এখন কিনা তার সাথেই অভিসার করে বেড়াচ্ছে মাধুরী। আশ্চর্য। টাকার জন্য এতো বিকিয়ে যায় কেউ? আমি কি চিটাগাং গিয়ে ওকে ফিরিয়ে আনবো? ওকি আসবে?

–সৈকত ভাই, আপনি চিটাগাং যাবেন না যেন।

–চিটাগাং? না, চিটাগাং যাবো না। কেন যাবো? যার জীবন তার হাতে।

আমি উদভ্রান্তের মতো আগুন তাতানো রোদ মাথায় নিজে এদিক সেদিক বেড়ালাম। ভুল, মানুষের জীবনটাই ভুল। আমি ভুল, মাধুরী ভুল, সবাই ভুল। শালা। সব পেয়েও হারানো বড় দুঃখের। নিজেকে এতো ক্ষুদ্র, নিঃস্ব মনে হয়। কতো একা আমি, কতো একা! নাজমুল নেই, শালা দরবেশ হয়েছে, তপস্যা করবে। মাধুরী নেই সে গেছে চিটাগাং, অভিসারে, তালুকদার হারামজাদার সাথে। আমার কথা কেউ ভাবলো না। কেউ না। কিংবা আমিই কখনো কারও কথা ভাবিনি। আমি নাজমুলের কথা তেমন করে কখনো ভেবেছি? মাধুরীর কথা ভেবেছি? আমরা কেউ কাউকে বুঝি না। কাউকে না--- আমি ছেলেটাকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলাম, সে আমার হাত চেপে ধরলো।

–সৈকত ভাই, কি হয়েছে আপনার?

–কে, রাইসুল? কিছু হয়নি তো।

–সিগারেট খাবেন?

–খাবো ।

আমরা একসাথে সিগারেট ধরালাম ।---কি হয়েছে সৈকত ভাই?

–রাইসুল, আমি মাধুরীকে হারিয়ে ফেলেছি । বড় কষ্ট হচ্ছেরে ভাই.....

রাইসুল হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো । --- একটা মেয়ে মানুষের জন্য এতো হাপিত্যেষ করে মরছেন কেন? দুনিয়ায় কি ওসবের অভাব পড়েছে? চলেন, আমার সাথে চলেন, গলা পর্যন্ত মদ খেয়ে সারা দুনিয়া ভুলে যাবো, কোথায় যায় ওসব মাধুরী টাধুরী? চলেন ।

আমি নিস্পৃহের মতো ওকেই অনুসরণ করতে থাকি । রাইসুল আপনমনে বললো---খবর শুনেছেন তো, সাজ্জাদ আর দেলোয়ারের লাশ ফেলে দিয়েছি । টাকাগুলো অবশ্য পাইনি । অনেক খুঁজলাম কিন্তু কোন হদিস পেলাম না! ছবিগুলোরও না! কোথায় যে সরিয়ে ছিলো আল্লাই মালুম । তবে হ্যাঁ, সাজ্জাদটা ঘোড়েল ছিলো বটে, আরেকটু হলে আমাকেই শেষ করে দিচ্ছিলো-------

আমরা দু'জন সে রাতে আকণ্ঠ মদ খেলাম । মাতাল হয়ে রাইসুল সাজ্জাদকে কুৎসিৎ ভাষায় গালাগালি করলো, আমি বিকট শব্দে কাঁদতে কাঁদতে মাধুরীকে ডাকলাম ।

আট

শফিক ফিরলো সকালে, হাসি মুখে । ঘরে ঢুকেই তার হাসি মিলিয়ে গেলো । তিথি নিরস গলায় বললো---তুই এসেছিস । আয়, মার পাশে বোস । গত তিন দিন হলো মার শরীর খারাপ, ভীষণ জ্বর, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না ।

ইতি বললো---শফি, মা না শুধু তোর কথা বলে ।

শফিক শুকনো মুখে মায়ের পাশে বসে 'মা' 'মা' বলে ডাকলো । খালাম্মা অর্ধচেতন অবস্থায় ছিলেন, তিনি সে ডাক শুনতে পেলেন না । ডাক্তার সাহেব বললেন তোমরা অতো ভীড় করে দাঁড়িও না রোগীকে একটু ফাঁকা জায়গায় থাকতে দাও, তাতে ওর শ্বাস নিতে সুবিধে হবে ।

শফিক সে কথায় কান দিলো না । সে মাকে জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো সশব্দে কাঁদতে লাগলো । গিয়াস ঘন ঘন চোখ মুছতে লাগলো । –আরে পাগলা, কাঁদিস না, কাঁদলে কি মা ভালো হয়ে যাবে? রীতা, তুমি ওকে একটু বোঝাও না ।

রীতা আজ অনেক সহজ, অনেক আন্তরিক। সে নির্দ্বিধায় শফিকের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মৃদুস্বরে বললো---এভাবে কাঁদতে নেই ভাই, তাতে সবারই খুব কষ্ট হয়। তুমি আমার সাথে এসো।

শফিক তাকেই জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো---ভাবী, আমার মা যদি মরে যায় আমি তাহলে ভবঘুরে হয়ে যাবো, সন্ন্যাসী হয়ে যাবো.....

দুপুরের উত্তপ্ততা তখন ধীরে ধীরে কমছে, চোখ ধাঁধাঁনো সোনালী রোদের ছটা ফ্যাকাশে হয়ে আসছে, খালাম্মা চোখ খুললেন। দুর্বল, ফ্যাসফেসে স্বরে জানতে চাইলেন ---শফিক এসেছে?

শফিক তার কঙ্কালসার মায়ের কোলে মাথা রাখলো---মা তুমি বেঁচে ওঠো। আমি সব সময় তোমার কথা শুনবো, সব সময়।

খালাম্মা হাসলেন। একে একে সবার উপর চোখ বোলালেন তার দৃষ্টিতে স্পষ্ট বিষাদের ছায়া।

তিথি বললো---কিছু বলবে মা?

—সে আসেনিরে? তাকে তোরা কিছু বলিসনি?

একই সাথে বরফের মতো জমে গেলো যেন সবাই। গিয়াস রুদ্ধ স্বরে বললো---তাকে কেন বলতে যাবো? সে আমাদের কে হয়?

খালাম্মা কোন জবাব দিলেন না, নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন। তিথি আঁচল দিয়ে সযত্নে তার অশ্রু মুছিয়ে দিলো।

—মা, আমি তাকে ডেকে আনছি।

—না, তিথি, তুই এ কাজ করতে পারিস না?

—ভাইয়া, তোমার যদি খারাপ লাগে তুমি তাহলে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যাও।

গিয়াস গেলো না, নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকলো।

—সৈকত ভাই । আপনি আমার সাথে আসুন।

—কোথায়?

—গেলেই দেখতে পাবেন।

প্রথম বিকালে ফাঁকা রাস্তা। উদ্দাম গতিতে ছুটে চলেছে রিক্সা, রিক্সাচালকের শুকনো পায়ে শক্তির কি স্ফুরণ। তিথি গম্ভীর, আমি হতবিহবল।

–সৈকত ভাই, আপনার কিছু জানতে ইচ্ছে করছে না?

–আমি বোধ হয় কিছুটা আন্দাজ করতে পারছি ।

–আমরা কোথায় যাচ্ছি বলুন তো?

–সিরাজ সাহেবের বাসায় ।

তিথি মিনিট খানেক নিশ্চুপ থেকে বললো---আপনি এখন আমাদের নিজেদেরই মানুষ । আপনার কাছে আর লুকিয়ে রাখার কোন মানে হয় না । আপনার শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে?

–যদি কোন অসুবিধা না থাকে.....

–ঘটনাটা বিশ বছর আগের, তিথি ছোট্ট একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো – আমার বয়েস ছয়, বিথীর তিন । আমাদের বাবাকে আপনি দেখেননি,তিনি খুব দাম্ভিক পুরুষ ছিলেন । মা তার কাছে কোন দিনই যথাযোগ্য সম্মান পাননি । ছ'বছর বয়সেও আমি স্পষ্ট বুঝতে পারতাম । বিয়ের আগে সিরাজ চাচার সাথে মায়ের প্রেম ছিলো, খুবই গাঢ় প্রেম । তারা একই গ্রামে থাকতেন । তার সাথে মায়ের বিয়ে হলো না । বিয়ে হলো বাবার সাথে । বিয়ের পর বাবা মা রাজশাহীতে চলে যান । সেখানেই ছ'বছর পরে মার সাথে সিরাজ চাচার আবার দেখা হয় । সিরাজ চাচারও তখন স্ত্রী আছে, দুটি মেয়ে আছে ।

তিথি আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছলো । রিক্সাচালক ছেলেটা কান খাড়া করে শুনছিলো, তার কাঁধে আলতো করে একখানা হাত রাখলো ও---এসব বড় দুঃখের কাহিনী ভাই, তুমি শুনো না । তুমি আমাদেরকে যতো তাড়াতাড়ি পারো কাঁঠাল বাগানে পৌঁছে দাও । তোমাকে পাঁচ টাকা বখশিস দেবো ।

ছেলেটি কোন কথা বললো না, রিক্সার গতি বাড়িয়ে দিলো ।

–তারপর?

–সিরাজ চাচা এবং মা দুজনে পালিয়ে গেলেন । এক মাস পরে তাদেরকে সিলেটে পাওয়া যায় । কয়েকজন আত্মীয়স্বজনের সহযোগিতায় একটা মীমাংসা হয়, যে যার সংসারে ফিরে যান । তিথি অস্বস্তি নিয়ে গায়ে হাত বোলালো---ঐ ঘটনার নয় মাস আটাশ দিনের মাথায় শফিক এবং ইতির জন্ম হয় ।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম । বাকী পথটুকু কোন কথা হলো না ।

সিরাজ সাহেব খবর শুনেই কাঁদতে লাগলেন---মাসুমা আমাকে দেখতে চেয়েছে, তুই সত্যিই বলছিস মা?

–হ্যাঁ, চাচা, আপনাকে একবারটি যেতে হবে ।

সিরাজ সাহেব করুণ চোখে তার স্ত্রীর দিকে চাহিলেন। ---চম্পার মা, তুমি বলে দাও---আমি যাবো? ও বোধহয় আর বাঁচবে না। নইলে আমাকে কিছুতেই ডাকতো না। যাবো, চম্পার মা?

ভদ্রমহিলা শান্ত স্বরে বললেন---যাও।

চম্পা বললো---আমি যাবো মা?

—যা।

আমরা বাসায় পৌঁছুলাম মাঝ বিকেলে! মাসুমা নামের মেয়েটি তখন আর বেঁচে নেই। অতীত যৌবনের ভালোবাসার মানুষটি কি অপার মমতায় তাকে জড়িয়ে ধরে নিঃস্বের মতো কাঁদছে, অপূর্ব দৃশ্যটি তার দেখা হলো না। মৃত্যুর সময় সিরাজকেই তার কেন মনে পড়লো?

○ ○ ○ ○ ○

এই বাড়ীতে খালাম্মার অস্তিত্ব ছিলো অস্পষ্ট, অন্তরালে। অথচ তার অভাবেই সমস্ত বাড়ীতে কি অদ্ভুৎ নীরবতা নেমে এসেছে!

বিথী ধীরে ধীরে সংসারের সমস্ত দায়-দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছে। মৃত মায়ের মতো সেও সবাইকে আগলে রাখতে চায়। তিথি তেমনি চুপচাপ, গম্ভীর। শফিক প্রায়ঃশই গভীর রাতে 'মা' 'মা' বলে কেঁদে উঠে। ইতি স্বাভাবিক, যেন সবকিছুই আগের মতই আছে। সাথী নতুন কেউ এলেই বলে---মা বেহেশতে গেছে, তাই না?

নয়

আমি মাধুরীকে ভোলার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছিলাম। ধুমকেতুর মতো আমার আকাশে প্রেমের অঞ্জলি সাজিয়ে এসেছিলো যে, আমার তখন ভালোবাসার মন ছিলো না, আমি তার কক্ষপথে দয়িতের স্বরূপ নিয়ে দাঁড়াতে পারিনি, মাধুরী চলে গেছে তার নিজ পথে, অনেকখানি অভিমান নিয়ে। এখন তাকে ভুলতে চাওয়া ছাড়া আমার আর কিইবা করার আছে?

আমি তার খোঁজ করিনি। জানি সে তিল তিল করে নিজেকে নিঃশেষ করবে তবুও সেই প্রত্যাখ্যানের যন্ত্রণা ভুলবে না, আমার কাছে সে আর কখনই ফিরে আসবে না। আমি আমার সমস্ত কষ্ট, সমস্ত হতাশা নিয়ে নিজের চারদিকে একটা নতুন সুশান্ত জগৎ গড়ে নিতে থাকি, জীবনের অনেকগুলো বছর কাটিয়েছি নোংরা ঘাটাঘাটি করে, আর ভালো লাগে না, এবার আমার একটু সুস্থির হওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু আমি মাধুরীকে ভুলতে পারি না। যখন কাজের মধ্যে থাকি, নানান ব্যস্ততায় শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত চলি ফিরি, তখন তাকে হৃদয়ের কোন সুগভীর কুঞ্জে বন্দী করে রাখি; কিন্তু গভীর রাতে, তারা জ্বলা আকাশে, দামাল বাতাসে, জোৎস্নার আকুলি বিকুলি খেলাতে, মাধুরী তার সুরভিত স্মৃতি বিকশিত করে আমাকে অধিকার করে নেয়, আমার ঘুম হারিয়ে যায়।

তবুও আমি মাধুরীকে ভুলে থাকার চেষ্টা করি।

○ ○ ○ ○ ○

তখন বর্ষাকাল। সারাক্ষণ বৃষ্টির ঝম ঝম নুপুরের শব্দ। আকাশে ঘন কালো মেঘের দুরন্ত ছুটাছুটি। ইলেকট্রিসিটি লাইনে ভেজা কাকের সারি। ভেজা মানুষের দল ঘরে ফেরে। আমি প্রায়শই বৃষ্টির ঝাঁক মাথায় নিয়ে রাস্তার পানি পায়ে দলে বিক্ষিপ্তভাবে হাঁটি, আমার অবরুদ্ধ মনে কবিত্বের প্রেরণা জাগে। আমি যেন নতুন করে জন্ম নিতে থাকি।

সেই বর্ষাতে তালুকদার খুন হলো। মাধুরীকে খুনের দায়ে অভিযুক্ত করা হলো। দৈনিক কাগজগুলোতে বড় বড় হরফে বেরুলো সে খবর। ঢাকার এক হোটেলের ভাড়া করা কামরায় তালুকদারের শরীরটাকে গুলিতে ঝাঝরা করে দেয় মাধুরী। হোটেলের সিকিউরিটি অফিসার দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। মাধুরী শান্তভাবে তার কাছে আত্মসমর্পন করে।

মাধুরী আমার উপর এইভাবে প্রতিশোধ নিলো? আমি কি এতোকিছুর যোগ্য ছিলাম? আমার সমস্ত আত্মাভিমান বৃষ্টির মতো ঝরে পড়লো। আমি মাধুরীর কাছে ছুটলাম।

মাধুরী দাঁড়িয়েছিলো গরাদের ওধারে। অনেক শুকিয়েছে, কণ্ঠার হাঁড় উঁকি দিচ্ছে, দুচোখের কোণে গাঢ় কালি, তবুও তেমনিই সুন্দর আছে ও, ওর ঠোঁটের বাঁকে সেই কুহকিনী হাসি আজও তেমনি জীবন্ত।

—প্রাণেশ্বর, আমি জানতাম তুমি আসবে।

—মাধুরী, এ তুমি কি করেছো?

—তেমন তো কিছু করিনি, প্রাণেশ্বর। পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে আমার শেকড়টাকেও উপড়ে নিয়ে গেলাম।

—আমার উপর তোমার এতো অভিমান! কেন তাহলে জোর করে আমাকে ধরে রাখলে না? কতো ছলাকলা জানো তুমি, তার সবটুকু দিয়ে আমাকে কেন বাঁধতে পারলে না?

–সৈকত, ওসব পুরানো কথা থাক। এতোদিন পর দেখা হলো, এসো অন্য কথা বলি। নাজমুল কেমন আছে? তিথি? বিথী? রাইসুল?

–মাধুরী, আমি তোমাকে মরতে দেবো না। তুমি দেখে নিও, আমি তোমাকে কিছুতেই মরতে দেবো না। আমার শরীরে সৈনিকের রক্ত, আমি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়ে যাব।

–পাগলামী করো না সৈকত। আমাকে তুমি কি করে বাঁচাবে? আমি তো সরল স্বীকারোক্তি করেছি। কোর্টে তাই বলবো। মরার আগে অযথা সবাইকে জ্বালিয়ে কি লাভ?

–তুমি আমাকে ভালোবাসো না? আমার জন্যে তোমার বাঁচতে ইচ্ছে করে না?

মাধুরী উদাস গলায় বললো---কিন্তু তুমি তো আমাকে চাওনি। কেনইবা চাইবে? আমার তো দেবার মতো কোন পরিচয় নেই।

আমি প্রবল আবেগে মাধুরীর দু'হাত চেপে ধরি।–আমার একটা কথা শোন, মাধুরী। আমি তখন নিজেকে বুঝতে পারিনি, তোমাকেও বুঝতে পারিনি, সবকিছু গুলিয়ে ফেলেছিলাম। মাধুরী, তোমাকে আমার দরকার, ভীষণ দরকার।

মাধুরী কাঁদতে লাগলো।–এই কথা এতো দেরীতে বললে প্রাণেশ্বর? আমারতো সময় শেষ।

–মাধুরী, আমি খুব বড় উকিল ধরবো, যতো টাকা লাগে ঢালবো, তুমি একটু শক্ত হও। একটা শয়তানকে খুন করার জন্য কারও ফাঁসি হতে পারে না।

–এতো টাকা তুমি কোথায় পাবে সৈকত, সেই আমি মরবই, মাঝখান থেকে তুমিও নিঃস্ব হবে।

–তুমিও মরবে না, আমিও নিঃস্ব হবো না। পুলিশকে যতোটুকু বলেছো আর নয়। আমি কালই উকিল নিয়ে আসবো।

মাধুরী কান্না জড়ানো গলায় বললো –তুমি আমাকে কেন আবার জীবনের স্বপ্ন দেখাচ্ছো, সৈকত? আমি তো মরবো বলে তৈরী হয়েই আছি।

আমি ওর মাথায় হাত রাখলাম।–তুমি মরবে না। আমাদের সংসার হবে, সবুজ শ্যামল গাঁয়ে ছোট্ট একটা কুঁড়েঘর থাকবে, সামনে একটুকরো সবজি বাগান, কতকগুলো হাঁস-মুরগী, তুমি উঠোনে চাল ছড়িয়ে দিয়ে ডাকবে---আয়, আয়, আমি মুগ্ধ চোখে তোমাকে দেখবো....

–সত্যি বলছো, সৈকত?

—সত্যি বলছি। মাধুরী।

○ ○ ○ ○ ○

আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন তিনজন – সিরাজ সাহেব, রাইসুল এবং রাজীব। আমি জানতাম না আমার মতো সামান্য মানুষের জন্যেও কারো কারো এতো হৃদ্যতা থাকতে পারে। যখন জানলাম, তখন অভিভুত হয়ে পড়লাম। স্নেহ ভালোবাসায় কোন পার্থিব নেই, তবুও তার শক্তি কি তীব্র!

মাধুরীর জন্য আমরা এডভোকেট শফিকুল ইসলামকে নিয়োগ করলাম। ভদ্রলোকের বয়েস হয়েছে, বার্ধক্য আসি আসি করছে। ছোট ছোট করে ছাঁটা কাঁচা পাকা চুল, ধবধবে সাদা মোচ, কামানো দাড়ি, পরিপাটি পোশাক-পরিচ্ছদ, সব মিলিয়ে ছোটখাটো স্থুলকায় মানুষটিকে দেখলেই বেশ ভালো লাগে, আস্থা জাগে, তিনি অত্যন্ত দুঁদে উকিল। কেসটাকে ভালো মতো পর্যবেক্ষণ করে বললেন---চিন্তা করবেন না। মাধুরীর ফাঁসি হবে না।

রাজীব নিজেও উকিল তবে অনেক জুনিয়র। সে বললো---কিন্তু স্যার, মাধুরী তো....নিজেই স্বীকারোক্তি দিয়েছে যে সেই তালুকদারকে হত্যা করেছে। তাছাড়া হোটেলের সিকিউরিটি অফিসার তাকে হাতে নাতে ধরেছে, পিস্তলে পর্যন্ত মাধুরীর স্পষ্ট হাতের ছাপ রয়েছে।

শফিক সাহেব হাসলেন। ---তবুও মাধুরীর ফাঁসি হবে না।

সিরাজ সাহেব করুণস্বরে বললেন---ওকে বাঁচিয়ে দিন উকিল সাহেব। টাকা-পয়সা নিয়ে কোন চিন্তা করবেন না। আল্লার মর্জিতে আমার পয়সা-কড়ির কোন অভাব নেই।

—সিরাজ সাহেব, মেয়েটি কি আপনার আত্মীয়া?

—জ্বি না, আমি তাকে চিনিও না।

—তাহলে?

○ ○ ○ ○ ○

সিরাজ সাহেব কোন উত্তর দিলেন না।

বিথী আমার সাথে প্রায় কথাই বলে না। মাঝে মাঝে শুধু চোখ মুখ বিকৃত করে জানান দেয়---মাধুরীর ফাঁসি হলে আমিও আপনাকে ফাঁসিতে ঝুলাবো।

—আমার কি দোষ? আমি তো ওকে খুন করতে বলিনি।

—বলেননি মানে? একশ'বার বলেছেন। মাধুরী আপাকে আপনি কোন সাহসে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন? নিজেকে ভাবেনটা কি আপনি? চেহারা সুরতের তো ঐ হাল, কথাবার্তায় আস্ত ক্ষ্যাত! মাধুরী আপা যে আপনাকে ভালোবাসে এটা আপনার কপাল।

আমি চুপ করে থাকি। বিথী বড় বেশী জেদী, একরোখা, ওকে সব কথা বোঝানো যায় না। ইতির সাথে আমার খুব ভাব হয়ে গেছে। সে প্রায়ই আমার হয়ে লড়ে।

—সৈকত ভাইয়ের কি দোষ? হাজার হোক একটা কলগার্ল।

—আর তোর সৈকত ভাই খুব সাধু ছিলো? টাউট ছিলো, পুরো টাউট। মানুষ ঠকিয়ে খেতো।

—তোকে বলেছে।

—জিজ্ঞেস করে দ্যাখ ওকে।

ইতি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করে না। জোর গলায় বলতে থাকে---না না, সৈকত ভাইয়ের কোন দোষ নেই।

আমি মনে মনে হাসি। এই মেয়েগুলি কি সহজে এক একজনকে ভালবেসে ফেলে। আমার তো এতো সহজে কারো প্রতি ভালবাসা জাগে না।

সিরাজ সাহেব প্রায়ই এই বাসায় আসেন, চম্পাও আসে। তাদেরকে দেখে এখন আর কেউ অখুশী হয় না, কটু কথা বলে না। মায়ের মৃত্যুর সাথে সাথে সেই অপমানজনক অধ্যায়টির শেষ হয়ে গেছে। সিরাজ সাহেব এসেই করুণ স্বরে বলেন---ও মায়েরা, এই বুড়োটাকে এক কাপ চা খাওয়াবে কেউ?

বিথী মুখ ঝামটা দেয়---সারা দুনিয়ায় চা কি আর কেউ বানায় না? এক কাপ চা খাওয়ার জন্য বুড়ো এতদূর মরতে আসে কেন?

—চা তো পাওয়া যায় রে মা, কিন্তু বকুনিটুকু যে জোটে না। ঐটার লোভেই আসি।

—বুড়োর কথা শোন।

বিথী সিরাজ সাহেবকে খুব যত্ন করে। চা দেয়, দোকান থেকে বিস্কুট এনে জোর করে খাওয়ায়, তার অসুখ বিসুখের খোঁজ খবর নেয়।

সাথী দেখা হলেই বলবে---ও সিরাজ চাচা, তোমার দাড়ি পেকে যাচ্ছে কেন?

—বুড়ো হচ্ছি যে মা।

—আমি কবে বুড়ো হবো?

—আমার মতো অনেক বয়েস হলে ।

—আমারও তখন দাড়ি পাকবে?

বিথী ধমকে ওঠে---ন্যাকার কথা শোন । যা ভাগ ।

ইতি খুব অদ্ভুৎ ব্যবহার করে । সিরাজ সাহেব যতক্ষণ এই বাসায় থাকেন ততক্ষণই সে তার সামনে ঘুর ঘুর করে কিন্তু কোন কথাবার্তা বলে না । সিরাজ সাহেব কিছু জিজ্ঞেস করলেও উত্তর দেয় না, উদাসীনভাবে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে । একমাত্র শফিকই সিরাজ সাহেবকে বিন্দুমাত্র দেখতে পারে না । সিরাজ সাহেব বাসায় এলেই সে চেঁচিয়ে উঠবে---ঐ যে প্রেমের নাগর এলেন, আমাকে এবার বাইরে যেতে হচ্ছে । সিরাজ সাহেব সেসব গায়ে মাখেন না । তিনি প্রত্যেকবার আসার সময় এক প্যাকেট আলাউদ্দিনের মিষ্টি নিয়ে আসেন । শফিক মিষ্টি খেতে ভালোবাসে । সেই মিষ্টির অধিকাংশই শফিকের পেটেই যায় । আমার ভাবতে ভালো লাগে, যতই দুঃখ-কষ্ট বিপত্তি থাকুক তবুও আমরা সবাই মিলেই একটি পরিবার ।

দশ

বসন্তের এক মধুময় দিনে মাধুরীকে কোর্টে নিয়ে যাওয়া হলো । কোর্ট প্রাঙ্গনে সেদিন অজস্র মানুষের সমাগম হয় । আশ্চর্য হলেও সত্য, মাধুরীর জন্য তাদের চোখে মুখে স্পষ্ট সহানুভূতি ছিলো । পত্রিকাগুলোও মাধুরীকে অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করলেও ঘৃণ্য বলে প্রমাণ করার কোন চেষ্টা করেনি । তাকে চুড়ান্ত শাস্তি না দেবার আবেদন আসতে থাকে সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে । মাধুরী খুব সহজেই একটি শহরকে জয় করে নিলো ।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় প্রথম উঠলেন, হোটেল দুবাইয়ের সিকিউরিটি অফিসার আসাদুজ্জামান খান । বাদী পক্ষের প্রধান কৌসুলী নাদের ভুঁইয়া জেরা করছেন ।

—যখন গুলি হয় তখন সময় কত ছিলো?

—রাত আটটার সামান্য বেশী ।

—আপনি তখন কোথায় ছিলেন?

—নীচতলায়, কাউন্টারে ।

—গুলির শব্দ শোনার পর কি করলেন?

—বুঝতে পারিনি শব্দটা কোথেকে এলো। কিন্তু পর পর দু'বার গুলির শব্দ হতে মোটামুটি একটা আন্দাজ পেয়ে গেলাম এবং প্রায় দৌড়ে তিনতলায় উঠে এলাম...

—আপনাদের হোটেলটি ক'তলা?

—তিনতলা।

—আচ্ছা। তারপর?

—চল্লিশ নম্বর রুমের দরজা খুলে মিস মাধুরী বেরিয়ে এলেন, তার হাতে পিস্তল। আমি দ্রুত রিভলভার বের করলাম।

—মিস মাধুরী কি পালানোর চেষ্টা করলেন?

—জ্বি না। তিনি পিস্তলটি ফেলে দিয়ে বললেন, আমি শামসু তালুকদারকে খুন করেছি। আমাকে পুলিশে দিন।

—এরপর আপনি কি করলেন?

—আমি প্রথমেই পিস্তলটি রুমাল জড়িয়ে সাবধানে কোটের পকেটে রাখলাম। তারপর মিস মাধুরীকে সহ কামরার ভেতর ঢুকলাম---

—চল্লিশ নম্বর রুমে?

—নিশ্চয়।

—কি দেখলেন?

—শামসু তালুকদার সাহেব উলঙ্গ হয়ে মেঝেতে পড়ে আছেন। তার শরীর রক্তে ভেসে যাচ্ছে। আমি দেখেই বুঝলাম তিনি মারা গেছেন। এরপরই আমি টেলিফোনে পুলিশকে খবর দেই।

—ইওর অনার, আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।

এবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এগিয়ে গেলেন এডভোকেট শফিকুল ইসলাম। তার মুখ হাসি হাসি। --- আপনার নাম আসাদুজ্জামান খান?

—জ্বি।

—আপনার নামটি বেশ সুন্দর।

—ধন্যবাদ ।

—আসাদুজ্জামান খান সাহেব । আপনি কেমন বোধ করছেন?

—জ্বি ভালো ।

—কাঠগড়ায় কি এই প্রথম উঠলেন?

—জ্বি, এটাই প্রথম ।

—নার্ভাস লাগছে না?

—একটু একটু ।

—সেটাই স্বাভাবিক । আমি যেদিন জীবনে প্রথম জিজ্ঞাসাবাদ করতে যাই, সেদিন আমার পা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিলো । লোকজন হেসে খুন । শেষে জজ সাহেবকে বিচার মূলতুবি রাখতে হলো ।

উপস্থিত সবাই হেসে ফেল্লাম ।

—ইওর অনার, আসাদুজ্জামান সাহেবকে আমার আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই ।

এরপর জেরা করা হলো হোটেল রিসেপশনিস্ট মিস জোবায়দা আখতারকে । তিনি জানালেন, খুনের দিন বিকেলে হোটেলে উঠে ছিলেন তালুকদার এবং মাধুরী । তারা এক সাথেই এসেছিলেন । রুমটি তালুকদার ছদ্ম নামে ভাড়া নেন । আরও দু'একজন হোটেল সংশ্লিষ্ট সাক্ষীর সাক্ষ্য নিয়ে সেদিনের মতো বিচারকার্য মুলতুবি ঘোষণা করা হলো ।

শফিকুল ইসলাম আমার কাঁধে সস্নেহে হাত রাখলেন । ---দুঃশ্চিন্তা করবেন না । আপনার মুখ অন্ধকার হয়ে আছে । ওটাকে হাসি হাসি রাখুন । দেখতে ভালো লাগে ।

—আমার খুব ভয় করছে, স্যার ।

—খুব ভয় করছে? তাহলে যান, একটা খুনোখুনির ছবি দেখে আসুন । দেখবেন, তখন আর বাঁচা মরার ব্যাপারটা কিছুই মনে হচ্ছে না । এমন কি আপনার নিজেরও খুব কায়দা করে গুলি ছুড়ে দু'একটি খুন করতে ইচ্ছে হবে ।

আমি হেসে ফেললাম । ---আপনি খুব মজার মানুষ ।

তিনিও হাসলেন। –আপনার কি ধারণা উকিলরা খুব কাঠখোট্টা হয়? ভুল, সবই ভুল। চলো রাজীব, চা-টা খাওয়া যাক। চলুন, সৈকত সাহেব। কি হলো সিরাজ সাহেব, কোর্টে এসেই দেখি আপনার শরীর ঠা-া হয়ে গেছে। ভয়ের কিছু নেই। চলুন, আপনাকে আজ আমি প্রথম শ্রেণীর চা খাওয়াবো।

সিরাজ সাহেব শুষ্ক হেসে বললেন---মাধুরী বাঁচবে তো?

○ ○ ○ ○ ○

আমার যেদিন সাক্ষ্য দেবার পালা এলো সেদিন আমি আশ্চর্য রকম স্থিরতা অনুভব করলাম। প্রথমে জেরা করতে এলেন শফিকুল ইসলাম।

–আপনার সাথে মিস মাধুরীর কি ধরণের সম্পর্ক ছিলো মিঃ সৈকত?

–বন্ধুত্বের।

–কেমন বন্ধুত্ব?

–খুবই ঘনিষ্ঠ।

–কতোটা ঘনিষ্ঠ? প্রেম জাতীয়?

আমি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা মাধুরীর দিকে চাইলাম। মাধুরী আমার চোখে চোখ রাখলো, তার সমস্ত মুখে উদ্ভাসিত হাসি।

–আমরা দুজন দুজনকে ভালবাসি।

–তাহলে আপনারা বিয়ে করলেন না কেন? নাকি বিয়ের কথা কখনই কেউ ভাবেননি।

–মাধুরী আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো। সংসার করার খুব সখ ছিলো। কিন্তু তখনও আমি বুঝিনি যে মাধুরীকে আমি কতোখানি ভালোবাসি। আমি বিয়েতে রাজী হইনি।

ভুঁইয়া তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করলেন।---অবজেকশন, ইওর অনার। এই ধরনের আবেগপ্রবণ কথাবার্তার উদ্দেশ্য আমার কাছে মোটেই পরিষ্কার হচ্ছে না।

জজ সাহেব জানতে চাইলেন ---মি: ইসলাম, আপনি নিশ্চয় ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করবেন?

–ইওর অনার, আমি আমার সমাপনী ভাষণে এই সব কিছুরই বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেবো। আপনার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ এই কেসের স্বার্থেই জনাব সৈকতকে কথা বলতে দিন।

–ঠিক আছে, আপনি জেরা করুন।

—হ্যাঁ, মি: সৈকত, এবার বলুন আপনি যখন বিয়েতে রাজী হলেন না তখন মিস মাধুরীর কি প্রতিক্রিয়া হলো?

—মাধুরী একেবারেই অন্য রকম হয়ে যায়। ও কখনই তেমন মদ খেতো না। কিন্তু তারপর থেকেই ও প্রচুর মদ খেতে শুরু করে।

—অর্থাৎ তিনি হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েন, তাই না?

—জ্বি।

—মিঃ সৈকত, ঠিক করে বলুন মিস মাধুরীকে আপনি কেন বিয়ে করতে চান নি?

—মাধুরী কলগার্ল, তাকে আমি অত্যন্ত পছন্দ করলেও ঘরনী হিসাবে কখনো চিন্তা করতে পারিনি। আমি কোন কুমারী মেয়েরই স্বপ্ন দেখতাম।

—ইওর অনার, আমার জেরা আপাতত শেষ।

এরপর এলেন ভূঁইয়া সাহেব। সাধারণ কতকগুলি প্রশ্নের পর তিনি জানতে চাইলেন---মাধুরীকে আপনি কতো দিন ধরে চিনেন?

—আট ন'বছর। সঠিক হিসেব নেই।

—তার সাথে আপনার কি ধরণের সম্পর্ক?

—ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের। একটু আগেই সে কথা বলেছি।

—শুধুই বন্ধুত্বের? আর কিছু নয়? মাধুরীর সাথে কি আপনার শারীরিক সম্পর্ক ছিলো না?

শফিকুল ইসলাম চেঁচালেন---অবজেকশন, ইওর অনার। এই কেসের সম্পূর্ণ বহির্ভূত ব্যাপার এটা।

—অবজেকশন সাসটেইন্ড।

—নো মোর কোয়েশ্চেইনস।

জেরার সময় মাধুরীকে অদ্ভুত রকম প্রশান্ত দেখালো, তার চোখে মুখে আতংকের কোন চিহ্নমাত্র নেই। পরিষ্কার গলায় সে ভুঁইয়া সাহেবে প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলো।

—আপনি কি জনাব শামসু তালুকদারকে হত্যা করেছেন?

—জ্বি।

উপস্থিত দর্শকদের ভেতর হতাশার চিহ্ন দেখা গেলো। জোর গুঞ্জন উঠলো। এমনকি ভুঁইয়া সাহেব নিজেও অবাক হয়ে গেলেন। জজ সাহেব টেবিলে হাতুড়ি পিটিয়ে সবাইকে চুপ করার নির্দেশ দিলেন।

ভুঁইয়া সাহেব বললেন---মিস মাধুরী, আপনি স্বীকার করছেন যে জনাব শামসু তালুকদারকে আপনি নিজের হাতে হত্যা করেছেন?

–জ্বি।

–কি ভাবে?

–তালুকদারের কোটের পকেটে লোগো পিস্তল থাকতো। আমি ওর সামনেই সেই পিস্তল বের করে মাত্র দু'হাত দূর থেকে পরপর দু'বার গুলি করি।

–আপনি পিস্তল চালানো কোথেকে শিখলেন?

–তালুকদারই আমাকে শিখিয়েছিলো।

ভুঁইয়া সাহেব জজ সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন---ইওর অনার, আসামী নিজেই স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করছেন যে তিনি মৃত তালুকদার সাহেবের পিস্তল দিয়েই পর পর দুটি গুলি করে তাকে হত্যা করেছেন, এরপর আর জিজ্ঞাসার কি থাকতে পারে।

শফিকুল ইসলাম এলেন হেলে দুলে, হাসি খুশি মুখে।

–মিস মাধুরী, জনাব শামসু তালুকদারের সাথে আপনার পরিচয় কবে থেকে?

–আমার বারো বছর বয়স থেকে।

–কিভাবে পরিচয়?

–আমি সাতক্ষীরা জেলার অন্তর্গত ধলবাড়িয়া গ্রামের মেয়ে। আমার বাবা মা অত্যন্ত গরীব ছিলেন। তালুকদার যখন আমাকে ঢাকায় আনতে চান সহজেই বাবা রাজী হয়ে যান। তালুকদার সেখান থেকে আমাকে ঢাকায় নিয়ে আসে, লেখাপড়া নাচগান শেখায়। আমার বয়স যখন আঠারো, তখন সে একরাতে আমাকে ধর্ষণ করে। এরপর থেকে সম্পূর্ণ দু'বছর আমি তার রক্ষিতার মতো হয়ে থাকি।

–আচ্ছা! তারপর কি হলো বলুন।

–তালুকদারের স্ত্রী এবং সন্তানেরা ব্যাপারটা মেনে নিতে পারে না। তারা নানানভাবে আমার উপর অত্যাচার করতে থাকে। আমার তখন মাঝে মাঝে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হতো। কিন্তু যাবার কোন জায়গা

ছিলো না। আমার বাবা-মা দুজনই ততোদিনে মারা গেছেন। তালুকদার শেষে কোন উপায় না দেখে আমাকে পুরানো পল্টনে একটি ফ্লাট কিনে দেয়। আমি সেখানেই থাকতাম।

—কিন্তু জনাব তালুকদারের রক্ষিতা থেকে কলগার্ল হলেন কিভাবে?

—ঐ ফ্লাটে আমি একাকী থাকতাম। তালুকদারের অনেক বন্ধুই আমার ঠিকানা জানতো। তারা নানানভাবে আমাকে বিরক্ত করতে থাকে। অনেক সময় তালুকদার নিজেও আমাকে জোর করে অনেকের কাছে পাঠাতো।

—আপনি কখনো পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেননি কেন?

—করেছিলাম। কিন্তু তালুকদার আমাকে খুঁজে বের করে।

—তারপর?

—আমি তালুকদারকে প্রায়ই বলতাম, আমি সংসার পাততে চাই। সে প্রথম প্রথম হাসতো, পরে বলতো আমাকে যদি কেউ বিয়ে করতে চায় তাহলে সে আপত্তি করবে না।

—আপনি কি সেজন্যেই সৈকত সাহেবকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন?

—না। সৈকতের সাতে আমার আট-ন' বছরের পরিচয়। ওকে আমি ভালোবাসতাম। সেজন্যেই ওকে বিয়ে করে ওর জীবনটা নষ্ট করতে চাই নি। হয়তো বিয়ের কথা নিজের থেকে কখনো বলতাম না। কিন্তু যেদিন বুঝলাম ও অন্য একটি মেয়েকে ভালোবাসতে শুরু করেছে, সে দিন আমি নিজেকে দমন করতে পারিনি।

—সৈকত সাহেব কি বিয়েতে রাজী হলেন না?

—ও কোন উত্তর দেয়নি। মাথা নীচু করে চলে যায়। আমি ওকে কোন দোষ দেইনা। আমাকে বিয়ে করলে ওকে সারাজীবন পালিয়ে বেড়াতে হতো।

—সেই সময়ে আপনার কি ধরনের অনুভুতি হয়?

—আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়েছিলো। কিন্তু সাহস হয়নি। এই নোংরা জীবনের কথা ভেবে ভীষণভাবে হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ি। তখন সবকিছু ভুলে থাকার জন্য প্রচুর মদ খেতাম।

—আপনি জনাব তালুকদারকে কেন খুন করলেন?

—সেই আমার জীবনটাকে নষ্ট করেছে। আমি প্রতিশোধ নিয়েছি।

—ইওর অনার, আমার কোন প্রশ্ন নেই।

এগার

সমাপনী ভাষণের দিন ভুঁইয়া সাহেব দৃপ্ত গলায় বললেন-মিস মাধুরী নিজ মুখে স্বীকার করেছেন, তিনি জনাব শামসু তালুকদারকে হত্যা করেছেন। হোটেল দুবাইয়ের সিকিউরিটি অফিসার আসাদুজ্জামান সাহেবও তাকে পিস্তল হাতে দেখেছেন, সেই পিস্তলে মিস মাধুরীর হাতের পরিষ্কার ছাপ পাওয়া গেছে। যদিও মিস মাধুরী নিজ হাতে জনাব শামসু তালুকদারকে গুলি করে হত্যা করছেন এই দৃশ্যটি কেউ প্রত্যক্ষ করেননি। কিন্তু তবুও আসামীর স্বীকারোক্তি এবং পারিপার্শ্বিক তথ্যপ্রমাণ থেকে এটি নিশ্চিত যে, মিস মাধুরীই জনাব শামসু তালুকদারের হত্যাকারী। আমি তার সর্বোচ্চ শাস্তি কামনা করি।

শফিকুল ইসলাম খুব নিয়ন্ত্রিত কণ্ঠস্বরে দৃঢ় আস্থার সাথে তার বক্তব্য পেশ করলেন।

—ইওর অনার, আমার বক্তব্যের প্রথমেই আমি স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, আমি মিস মাধুরীকে আদৌ নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করবো না। আমি শুধু এটাই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো একজন সরলমতি গ্রাম্য বালিকা নিয়তির যে নিষ্ঠুর পরিণতির শিকার হয়েছে, তাকে আমরা কোনভাবেই দায়ী করতে পারি না।

মিস মাধুরীর জবানবন্দিতে আমরা তার অতীত জীবনের ইতিহাস শুনেছি। আমরা জেনেছি জনাব শামসু তালুকদার কিভাবে তার পিতামাতার দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে তাকে শহরে নিয়ে আসেন এবং পরবর্তীতে তার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে তাকে রক্ষিতায় পরিণত করেন। জনাব তালুকদার অত্যন্ত ক্ষমতাধর মানুষ ছিলেন। মিস মাধুরী তার নোংরা জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে যান। পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন, তখন তালুকদার সাহেব তার লোকবল খাটিয়ে তাকে ফিরে আসতে বাধ্য করেন। বলা চলে মিস মাধুরী সম্পূর্ণ জনাব তালুকদারের রক্ষিতা ছিলেন।

আমরা আরও জেনেছি মিস মাধুরী সৈকত সাহেবকে ভালোবাসতেন এবং তাকে বিয়েও করতে চেয়েছিলেন। সৈকত সাহেব তার জবানবন্দিতে বলেছেন, মাধুরীকে ভালোবাসা সত্বেও শুধুমাত্র তার ঘৃন্য পেশার জন্যেই তিনি তাকে বিয়ে করতে রাজী হননি। ইওর অনার, একটি অসহায় মেয়ে যাকে তার ইচ্ছের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে বারবনিতার কাজ করতে হতো। সেই মেয়েটির অনুভূতির কথা একবার ভেবে দেখুন, প্রত্যাখ্যানের সেই বেদনাময় মুহূর্তে নিজের পেশার উপর তথা সমগ্র জীবনের উপর এ অসহায় মেয়েটির কি তীব্র বিতৃষ্ণা জন্মানো সম্ভব!

ইওর অনার, অনুভূতির সেই যন্ত্রণাময় মুহূর্তে সেই মেয়েটির মাঝে যদি নির্মম প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে, তবে কি আমরা তাকে অপরাধী বলে সনাক্ত করবো? যদি সেই তীব্র প্রতিশোধ স্পৃহা তাকে নর পিশাচরূপী একজন মানুষকে বধ করতে প্রেরণা যোগায় তবে কি আমরা তাকে অপরাধী বলে

সনাক্ত করবো? যদি সে তার জীবনের সকল যন্ত্রণা এবং অসহায়ত্বের নাগপাশ ত্যাগ করে একবার সরল হৃদয় নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে চায় তবে কি আমরা তাকে অপরাধী বলে সনাক্ত করবো?

হ্যাঁ, হত্যা একটি চরম অপরাধ, ইওর অনার। কিন্তু যে কোন হত্যাই চরম অপরাধ নয়। যে হত্যা কোন কু উদ্দেশ্যকে সংশ্লিষ্ট করে ঠা-া মাথায় সংঘঠিত হয়, সেটিকে যদি আমরা হত্যার সর্বোচ্চ একক বলে ধরে নেই, তাহলে এই লাঞ্ছিত, নিপীড়িত মেয়েটি নিতান্তই প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উত্তেজনার বশে যে হত্যাটি করেছে, তাকে আমরা কোথায় দাঁড় করাবো?

ইওর অনার, আমি আপনার কাছে বিনীতভাবে প্রার্থনা করছি, আপনার সুবিবেচনা দিয়ে এবং সকল তথ্য প্রমাণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করে আপনি মিস মাধুরীর অপরাধের বিচার করুন। মিস মাধুরী ঘৃন্য খুনী নন, তিনি একটি চরম পরিস্থিতির শিকার মাত্র, মৃত তালুকদার সাহেবের নিষ্ঠুর স্বেচ্ছাচারিতা এবং বর্বরতা যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিলো।

ইওর অনার, পরিশেষে আপনার কাছে সবিনয় নিবেদন, মিস মাধুরীকে তার অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য যদি শাস্তি দিতেই হয় তাহলে তা অবশ্যই অত্যন্ত স্বল্প মেয়াদের হওয়া উচিৎ, যেন এই চির বঞ্চিত মেয়েটি নতুন করে তার জীবনকে গড়ে নেবার সুযোগ পান এবং একটি সুখী সুন্দর সংসারের যে স্বপ্ন তার অন্তরের অন্তঃস্থলে লুকিয়ে আছে তা বাস্তবায়িত করতে পারেন। একজন দুঃখী মানুষের প্রতি এইটুকু করুণা দেখানোর মতো উদারতা আইনের নিশ্চয় আছে।

পরিশিষ্ট

গরাদের ওপাশে মাধুরীকে কি অপরূপ সুন্দর দেখাচ্ছে, শুষ্ক এলোচুল ছড়িয়ে আছে পিঠময়, ঘনকৃষ্ণ মায়াবী আঁখিতে ঝলকিত স্বপ্নের ঝাঁক, চঞ্চল ওষ্ঠের বাঁকে সেই কুহকিনী হাসির লুকোচুরি।

—প্রাণেশ্বর, তুমি আমাকে মরতেও দিলে না।

—এখনও মরতে ইচ্ছে হয়?

—মরণ কি একরকমই, প্রাণেশ্বর! আরও কতো রকমের মরণ আছে।

—তুমি এমন ন্যাকা ন্যাকা কথা বল না।

—আমার সব কিছুইতো তোমার কাছে ন্যাকামি।

আমরা পরস্পরের স্পর্শের গন্ধ নিতে নিতে দীর্ঘক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি। কতো কথা বলতে ইচ্ছে হয়, বলি না। এই নিঃশব্দ স্পর্শটুকু নষ্ট করতে কারুরই সাহস হয় না।

গার্ড নীরস গলায় জানালো---যান যান, সময় শেষ।

মাধুরী আমার হাতে হাত রাখলো।

—আমার জন্যে অপেক্ষা করবে তো —সৈকত?

—করবো, মাধুরী।

—চিরকাল?

—চিরকাল।

বাইরে তখন কি সুন্দর মায়াবী জোস্‌না। সেই জোসনার স্নিগ্ধ আলোতে কি পরম মমতায় এক যুবক এক যুবতীর হাতে হাত রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। ওদের চোখ মুখ ভালবাসার উজ্বল আলোতে উদ্ভাসিত।

------শেষ------